কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম মহাবিদ্যালয়

কেশবপুর, হুগলী

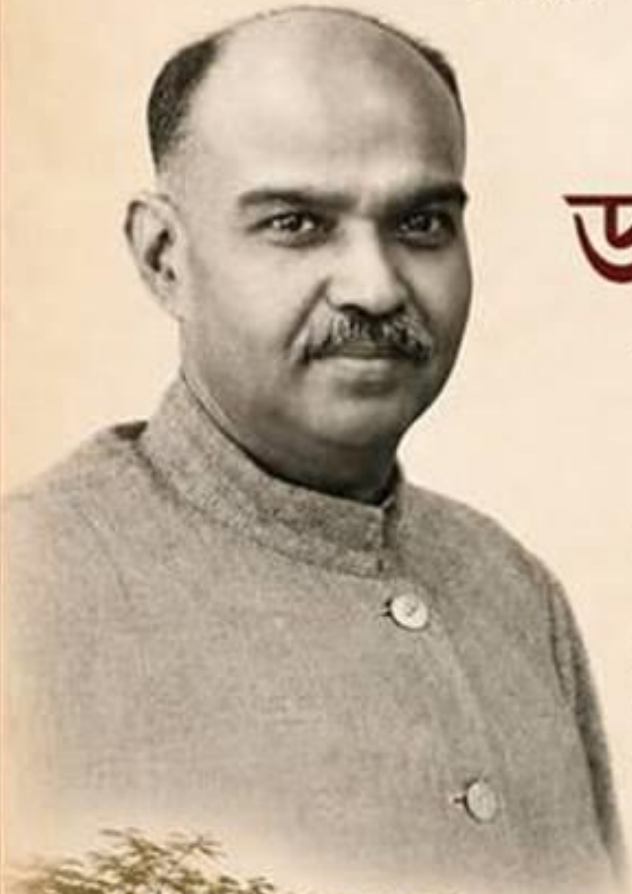

ভারতকেশরী

ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

স্মারক পুস্তিকা

১২৫তম
জন্মবার্ষিকীতে জানাই
সশ্রদ্ধ প্রণাম।

জুলাই, ২০২৬

পুস্তিকা পরিচিতি

ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় স্মারক পুস্তিকা
Dr. Shyama Prasad Mukhopadhyay Smarak Pustika

ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এর ১২৫ তম জন্ম বার্ষিকী উপলক্ষ্যে
কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম মহাবিদ্যালয় থেকে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে প্রকাশিত

প্রকাশক : ডঃ মহামায়া লাহা মুখার্জী, অধ্যক্ষ, কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম মহাবিদ্যালয়

প্রকাশকাল : ৬ জুলাই, ২০২৬

উদ্যোগে : কালচারাল সাব-কমিটি ও আই কিউ এ সি

প্রচ্ছদ, বর্ণবিন্যাস ও অলঙ্করণ : প্রভাত চন্দ্র হাজরা ও ডঃ শুভ্রশ্রী বেরা

চিত্র ও উক্তি ঋণ : উইকি কোটস, ন্যাশনাল আর্কাইভস অফ ইন্ডিয়া, ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রিসার্চ ফাউন্ডেশন

যোগাযোগ : কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম মহাবিদ্যালয়, কেশবপুর, হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭১২৪১৩, ই-মেলঃ kkmmv.keshabpur@gmail.com, ফোনঃ 03211-250016

স্বত্বাধিকারী : © কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম মহাবিদ্যালয়, কেশবপুর, হুগলী

এই স্মারক পুস্তিকার পিডিএফ সংস্করণটি মহাবিদ্যালয়ের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে
https://kabikankanmukundarammahavidyalaya.org/

ভারতকেশরী

ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

(৬ জুলাই ১৯০১ – ২৩ জুন ১৯৫৩)

দেশপ্রেম, ত্যাগ ও আদর্শের অমর প্রতীক

ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় স্মারক পুস্তিকা
কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম মহাবিদ্যালয়

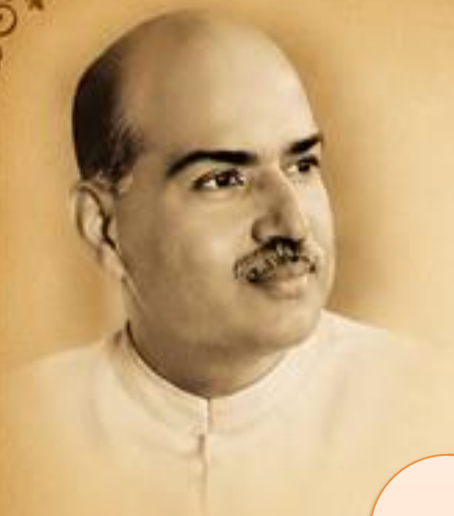

সূচিপত্র

১। অধ্যক্ষের কলমে – ১

২। একবিংশ শতকে অখণ্ড ভারতের স্বপ্নদ্রষ্টার চিন্তার আলোকে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় : দূরদর্শী ভারতসন্তান - আব্দুল জামান নাসের ২

৩। সভ্যতার দর্শন ও জাতীয় পুনর্জাগরণ: শ্রী অরবিন্দের তাত্ত্বিক উত্তরাধিকার ও শ্যামাপ্রসাদের ভারত-ভাবনা – ডঃ শুভ্রশ্রী বেরা ৭

৪। সত্তা ও স্মরণে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় – ডঃ নন্দ কুমার পাখিড়া ১৩

৫। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়: শিক্ষা, মাতৃভাষা ও জাতীয় সংহতির অগ্রদূত – ডঃ সেখ আবুল ১৯

৬। রাজনীতির নেপথ্যে এক ঋষিতুল্য ব্যক্তিত্ব: ড. শ্যামা প্রসাদ মুখোপাধ্যায় - ডঃ তন্ময় নায়েক ২৪

৭। The Bengal Famine and Dr. Shyama Prasad Mookerjee: Humanitarian Leadership in a Time of Catastrophe – Probhat Chandra Hazra ৩১

৮। এক বিরল ব্যক্তিত্বের কিছু দুর্লভ আলোকচিত্র - ৩৫

৯। ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এর হস্তাক্ষর – ৩৭

১০। পরিশেষে - ৩৮

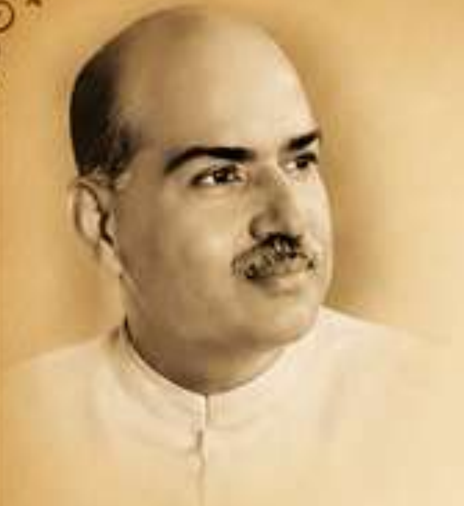

অধ্যক্ষের কলমে

ভারতবর্ষের নবজাগরণ, শিক্ষা, শিল্পোন্নয়ন ও জাতীয় জীবনের ইতিহাসে ভারতকেশরী ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এক অনন্য ব্যক্তিত্ব। তাঁর জীবন আমাদের শেখায়—দেশপ্রেম, সততা, কর্তব্যনিষ্ঠা এবং আত্মত্যাগই প্রকৃত জাতি নির্মাণের ভিত্তি।

ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ১২৫তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম মহাবিদ্যালয়ের উদ্যোগে প্রকাশিত এই ‘ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় স্মারক পুস্তিকা’ কেবল একটি স্মরণগ্রন্থ নয়; এটি তাঁর জীবন, দর্শন, কর্ম ও চিন্তার বহুমাত্রিক মূল্যায়নের একটি আন্তরিক প্রয়াস। মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মননসমৃদ্ধ প্রবন্ধসমূহ এই সংকলনকে সমৃদ্ধ করেছে। আশা করি, আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা পাঠকমহলে ডঃ মুখোপাধ্যায়ের জীবনাদর্শ সম্পর্কে নতুন করে আগ্রহ সৃষ্টি করবে এবং বিশেষত নবীন প্রজন্মকে দেশপ্রেম, নৈতিকতা ও জাতীয় চেতনার আদর্শে উদ্বুদ্ধ করবে।

এই প্রকাশনার সঙ্গে যুক্ত সকল শিক্ষক-শিক্ষিকা, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সহযোগিতাকারী সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানাই। তাঁদের সম্মিলিত প্রয়াসেই এই স্মারক পুস্তিকা প্রকাশ সম্ভব হয়েছে।

পরিশেষে, ভারতকেশরী ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের পবিত্র জন্মবার্ষিকীতে তাঁর স্মৃতির প্রতি জানাই আমাদের গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলি।

শুভেচ্ছান্তে,
ডঃ মহামায়া লাহা মুখার্জী
অধ্যক্ষ
কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম মহাবিদ্যালয়
কেশবপুর, হুগলী
০৬/০৭/২০২৬

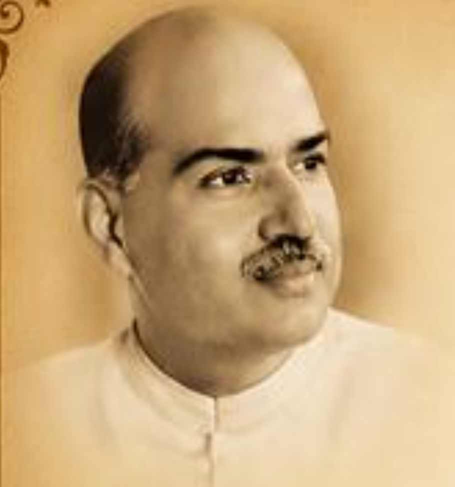

একবিংশ শতকে অখণ্ড ভারতের স্বপ্নদ্রষ্টার চিন্তার আলোকে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় : দূরদর্শী ভারতসন্তান

আব্দুল জামান নাসের
সহযোগী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম মহাবিদ্যালয়

অনন্য বাগ্মী, দূরদর্শী সমাজসংস্কারক ও শিক্ষাবিদ ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় পবিত্র ভারতভূমির সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষার এক অবিচল ও দৃঢ় দিশারী। স্বাধীন ভারতবর্ষে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের প্রতিষ্ঠা এবং কাশ্মীরের ভারতভুক্তি আন্দোলনে তাঁর বিশেষ অবদান উল্লেখযোগ্যভাবে স্মরণীয়। শিক্ষাবিদ হিসেবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মাত্র ৩৩ বৎসর বয়সে উপাচার্য হয়ে শিক্ষাক্ষেত্রে যে সংস্কারগুলি শ্যামাপ্রসাদ চালু করেছিলেন, তা শিক্ষার মানোন্নয়নে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ১৯৩৪ থেকে ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত উপাচার্য থাকাকালীন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে Students' Welfare League এবং বাধ্যতামূলক শারীরিক শিক্ষা চালু করেন। নিয়মিত গবেষণার অগ্রগতি এবং উন্নত মানের গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন। উচ্চশিক্ষার প্রসারে মাতৃভাষার প্রয়োগ ও ভূমিকার বিষয়টিকেও তিনি যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনায় এনেছিলেন।

বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ড. শ্যামাপ্রসাদ আইনের সর্বোচ্চ ডিগ্রি অর্জনের পর ১৯২৪ সালে, ২৩ বৎসর বয়সে, কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবী হিসেবে নাম নথিভুক্ত করেন। ১৯৪৭ সালে স্বাধীনোত্তর ভারতের পুনর্গঠনে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর সরকারে কংগ্রেসী না হওয়া সত্ত্বেও মন্ত্রিসভায় যোগ দিয়ে শ্যামাপ্রসাদ

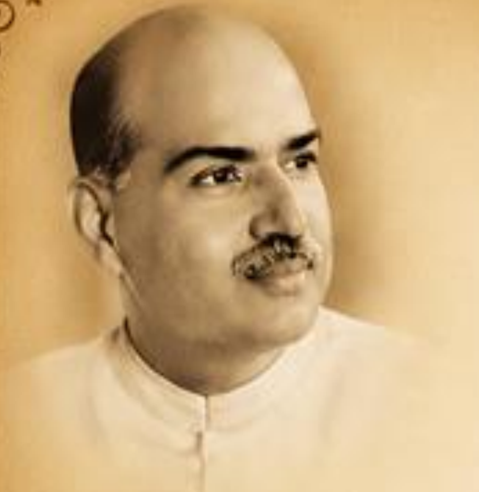

মুখোপাধ্যায় সরকারি নীতির ক্ষেত্রে ভিন্ন ভাবনায় স্বতন্ত্র অবস্থান নিয়েছিলেন। তিনি মহাত্মা গান্ধী এবং নেহরুর আমন্ত্রণে মন্ত্রিসভায় যোগ দিয়ে স্বাধীন ভারতের প্রথম জাতীয় সরকারের শিল্প ও সরবরাহমন্ত্রী হন।

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ১৯৪৮ সালে স্বাধীন ভারতের প্রথম শিল্পনীতি ঘোষণা করেন, যা ভারতের মিশ্র অর্থনীতির ভিত্তি স্থাপন করেছিল। তিনি যে ক্ষেত্রেই কাজের সঙ্গে যুক্ত থেকেছেন, সেখানেই দেশীয় সংস্কৃতি ও রাষ্ট্রীয় নিজস্ব স্বদেশভূমির সমৃদ্ধির সাধনা করেছেন।

ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে স্বামী প্রণবানন্দের ঐতিহাসিক সাক্ষাৎ হয় ১৯৪০ সালে। বাংলার হিন্দু সমাজের দুর্দশা মোচনে স্বামী প্রণবানন্দ মহারাজ শ্যামাপ্রসাদবাবুকে নির্দেশ দিয়ে বলেছিলেন, "রাজনীতি ও সমাজসেবাকে দেশের মানুষের আত্মরক্ষা ও চরিত্রগঠনের হাতিয়ার করো।"

এই সাক্ষাতের পর ড. মুখোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে পরিবর্তন আসে এবং তৎকালীন রাজনৈতিক বাস্তবতা থেকে হিন্দু সমাজের আত্মরক্ষারআন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। ভারত সেবাশ্রম সংঘের মূলমন্ত্র— সেবা, আত্মরক্ষা এবং নির্ভীক দেশাত্মবোধ— ছিল তাঁর আদর্শ। এই মন্ত্রের প্রতিফলন শ্যামাপ্রসাদবাবুর জীবনের সর্বক্ষেত্রে দেখা যায়।

১৯৪৩ সালের মন্বন্তরের পর তিনি ব্রিটিশদের শোষণের মুখোশ খুলে দিতে বিখ্যাত বই *Leave Bengal Alone* লিখেছিলেন। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ১৯৪০-এর দশকে যখন কবি নজরুল দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হন এবং তাঁর পরিবার চরম আর্থিক সংকটে পড়ে তখন অন্যতম রাজনীতিবিদ হিসেবে তাঁদের সাহায্যে এগিয়ে আসেন। কবি নজরুলের চিকিৎসার খরচ ও তাঁর পরিবারের ভরণপোষণের জন্য শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় অর্থ ও অন্যান্য সাহায্য প্রদান করেন। শ্যামাপ্রসাদের এই মহানুভবতায় মুগ্ধ হয়ে কবি তাঁকে একটি চিঠি লিখেছিলেন।

সেই চিঠিতে কবির অসহায়ত্ব এবং শ্যামাপ্রসাদের প্রতি অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতা ও সম্মানের প্রতিফলন ঘটেছিল। ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে প্রবেশের পর ১৯৩৯ সালে অখিল ভারত হিন্দু মহাসভার কলকাতা অধিবেশনে উল্লেখযোগ্যভাবে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৪০–৪৪ সালের জন্য অখিল ভারত হিন্দু মহাসভার কার্যকরী সভাপতি এবং বাংলার হিন্দু মহাসভার সভাপতি হন।

১৯৪১ সালের ১১ই ডিসেম্বর থেকে ১৯৪২ সালের ২০শে নভেম্বর পর্যন্ত এ. কে. ফজলুল হকের প্রগতিশীল মোর্চার মন্ত্রিসভায় বাংলার অর্থমন্ত্রী হন। ১৯৪২ সালের আগস্ট বা 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে মেদিনীপুর এবং অন্যত্র বাংলার গভর্নরের দমননীতির প্রতিবাদে বাংলার মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেন।

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বাংলা থেকে গণপরিষদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। গণপরিষদের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হিসেবে মৌলিক অধিকারের বিষয়ে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিলেন। তিনি একীভূত ভারতের পক্ষে সওয়াল করেছিলেন। তিনি সুরাবর্দী ও শরৎ বসুর ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন স্বাধীন যুক্তবাংলার পরিকল্পনার বিরোধিতা করে তৎকালীন পূর্ববঙ্গের পশ্চিম অংশ নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। এর ফলে পশ্চিমবঙ্গ পাকিস্তানের অংশ থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়।

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট স্বাধীন ভারতের জাতীয় সরকারে তিনি শিল্প ও সরবরাহ দপ্তরের ভার গ্রহণ করেন। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর হিন্দু মহাসভাকে রাজনৈতিক কার্যকলাপ পরিত্যাগ করে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কাজে নিয়োজিত হওয়ার উপদেশ দেন। পূর্ব পাকিস্তানে প্রলয়ঙ্কর হিন্দুবিরোধী দাঙ্গা, তার পরিপ্রেক্ষিতে স্বাক্ষরিত নেহরু–লিয়াকত সংখ্যালঘু স্বার্থরক্ষা চুক্তির বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী নেহরুর সঙ্গে তাঁর তীব্র মতপার্থক্য হয় এবং সেই কারণেই ১৯৫০ সালের ৮ই এপ্রিল কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা থেকে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় পদত্যাগ করেন।

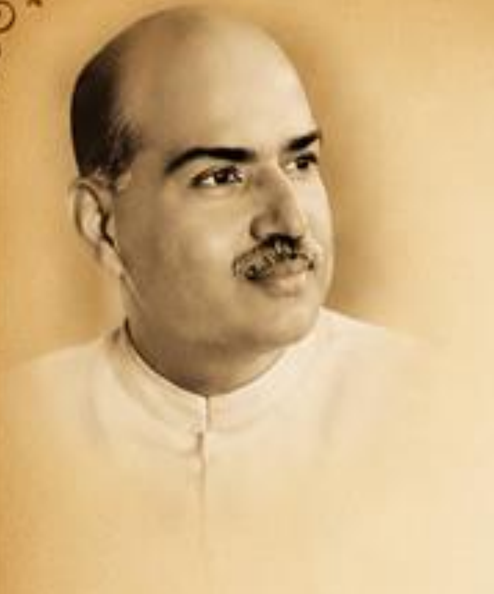

১৯৫২ সালের সাধারণ নির্বাচনে দক্ষিণ কলকাতা কেন্দ্র থেকে লোকসভার সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৫৩ সালে জম্মু ও কাশ্মীরের সদ্য ভারতভুক্তির প্রশ্নে তৎকালীন ভারত সরকারের সঙ্গে মতবিরোধ হয় এবং নেহরু-শেখ আবদুল্লার চুক্তির বিরোধিতায় তিনি ৩৭০ ধারায় জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের বিশেষ মর্যাদা বাতিলের দাবি জানান। ভারতের অন্যান্য রাজ্যের মতো কাশ্মীরেও বিনা পারমিটে প্রবেশের অধিকার দাবি করেন এবং কাশ্মীরের জন্য আলাদা নিশান, আলাদা বিধান ও আলাদা প্রধান ব্যবস্থার প্রতিবাদে কাশ্মীরে প্রবেশের যাত্রায় তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

শ্রীনগরে এক নির্জন অতিথিনিবাসে আটক থাকা অবস্থায় তিনি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং ১৯৫৩ সালের ২৩শে জুন শ্রীনগর সরকারি হাসপাতালে প্রয়াত হন। তাঁর মহাপ্রয়াণের পর তাঁর শ্রদ্ধেয়া মাতা যোগমায়া দেবীর আবেদন মেনে তৎকালীন ভারত সরকার মৃত্যুর কারণ তদন্তের উদ্যোগ গ্রহণ করেননি, যা আজও দেশবাসীর কাছে অজানা।

স্বাধীন ভারতে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের অবদান ও কর্মের প্রভাবের যথাযথ মূল্যায়ন প্রয়োজন। দেশের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষার স্বার্থে তাঁর ঐক্যবদ্ধ ভারতভূখণ্ডের স্বপ্ন আজও বাস্তবতায় অপূর্ণ। দেশের ঐক্য ও সংহতির বার্তাকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ভাবনা আজও পথ দেখাতে পারে। আমাদের মুক্তমনে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জীবন ও কর্মকে বিচার করতে হবে।

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের যথাযথ মূল্যায়নের জন্য মহাত্মা গান্ধীর বিখ্যাত উক্তিটি অবশ্যই স্মরণীয়– "আমি যদি আরও দুজন শ্যামাপ্রসাদ পেতাম, তবে ভারতের রাজনৈতিক মানচিত্র বদলে দিতাম।"

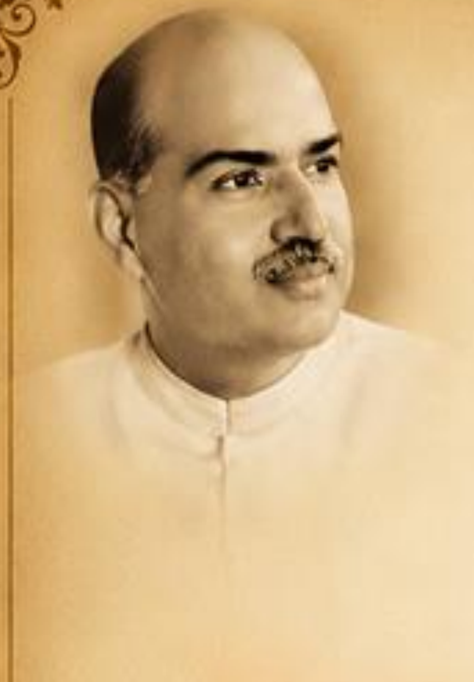

জওহরলাল নেহরু তাঁর বাগ্মিতা ও অসাধারণ যুক্তিপূর্ণ বক্তব্যের কারণে তাঁকে 'The Lion of Parliament' বলতেন। ১৯৫২ সালে লোকসভায় তাঁর ভাষণে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কাশ্মীর সম্বন্ধে যে ভবিষ্যদ্বাণী জানিয়েছিলেন, তা আজও কঠোর বাস্তব— আজকের এই ভুলনীতি ভবিষ্যতে কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদ ও বিচ্ছিন্নতাবাদের জন্ম দেবে।

অসাধারণ পণ্ডিত ও দূরদর্শী রাষ্ট্রচিন্তক শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের বিকল্প অখণ্ড ভারত গঠনের পরিকল্পনাকে যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে গ্রহণ করা হলে, আজ হয়তো স্বপ্নের ভারত, সোনার ভারত বিশ্বের জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসনে চিরঅক্ষয় হয়ে থাকতো। ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জীবন ও কর্ম ভারতআত্মার জীবন্ত প্রতীক এবং নৈতিকতার উজ্জ্বল নিশান। এই রাষ্ট্রবাদী সাধক, ভারতকেশরী যুগপুরুষকে সশ্রদ্ধ প্রণাম।।

- If we are to live and grow as a university, one of whose paramount tasks is to not only leaders of thought and action but also workers dedicated to the service of the nation, we cannot sit idle with philosophic concern and let things drift as they may. So far as we are concerned, it is for us to set our house in order. It is for us, and specially the younger generation, Hindus, Moslems and Christians alike, to combine and resolutely stand for the permanent well-being of our province and to rescue her from the deadly stagnation which now seems to envelop her.
  - *Speech delivered at Calcutta University Convocation on 2nd March 1935.*

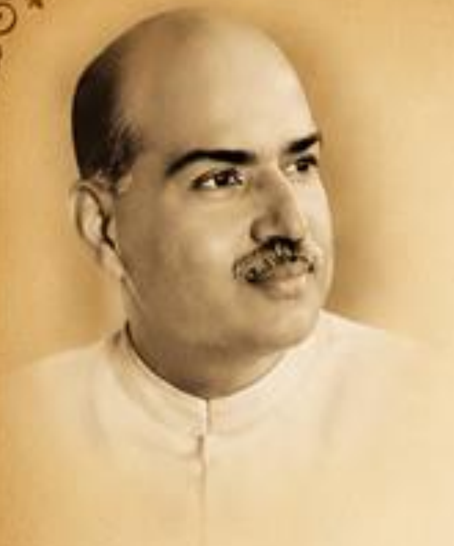

সভ্যতার দর্শন ও জাতীয় পুনর্জাগরণ: শ্রী অরবিন্দের তাত্ত্বিক উত্তরাধিকার ও শ্যামাপ্রসাদের ভারত-ভাবনা

ডঃ শুভ্রশ্রী বেরা

সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম মহাবিদ্যালয়

ভারতের ইতিহাসে এমন কিছু মানুষ আছেন, যাঁদের জীবনকে কেবল রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে আবদ্ধ করে বিচার করলে তাঁদের প্রকৃত পরিচয় অধরাই থেকে যায়। তাঁদের চিন্তার উৎস আরও গভীরে—সভ্যতার স্মৃতি, সংস্কৃতির ধারাবাহিকতা এবং মানুষের অন্তর্জাগতিক বিবর্তনের মধ্যে। ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সেই বিরল ব্যক্তিত্বদের অন্যতম। তাঁকে সাধারণত রাজনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ কিংবা সাংগঠনিক নেতা হিসেবে স্মরণ করা হয়; কিন্তু তাঁর চিন্তার অন্তঃসলিলায় প্রবাহিত ছিল ভারতের দীর্ঘ সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের এক গভীর অনুসন্ধান। রাষ্ট্র, শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং জাতীয় পুনর্জাগরণ সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি বিচ্ছিন্ন কয়েকটি রাজনৈতিক মতের সমষ্টি নয়; বরং এক সুসংহত দার্শনিক বোধের বহিঃপ্রকাশ।

এই দার্শনিক বোধের অন্যতম উৎস ছিল ঋষি শ্রী অরবিন্দের চিন্তাজগৎ। এখানে প্রভাব বলতে অন্ধ অনুসরণকে বোঝায় না; বরং দুই মনীষীর মধ্যে এক ধরনের আত্মীয়তা বোঝায়। একজন বিপ্লবী থেকে যোগীতে রূপান্তরিত হয়ে ভারতের আত্মিক ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যে স্বপ্ন নির্মাণ করেছিলেন, অন্যজন স্বাধীনতার দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে সেই স্বপ্নকে শিক্ষা, রাষ্ট্রনীতি এবং সাংস্কৃতিক পুনর্গঠনের বাস্তব পরিসরে রূপ দিতে চেয়েছিলেন। এই দুই জীবন তাই একই নদীর দুটি ভিন্ন স্রোতের মতো—পৃথক, অথচ উৎসের গভীরে পরস্পর-সম্পর্কিত।

শ্যামাপ্রসাদের রাষ্ট্রচিন্তার ভিত ছিল ইতিহাসের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা। তাঁর কাছে ভারত কোনো সাম্প্রতিক রাজনৈতিক নির্মাণ নয়; বরং বহু সহস্রাব্দের সাংস্কৃতিক অভিযাত্রার ফল। ভাষা, ধর্ম, জাতিগত বৈচিত্র্য কিংবা আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্য এই ঐক্যের প্রতিবন্ধক নয়; বরং তার স্বাভাবিক প্রকাশ।

ভারতবর্ষের ভূগোল যেমন অসংখ্য নদী, পর্বত ও জনপদের সমষ্টি, তেমনি তার সভ্যতাও বহুস্বরের সমন্বয়ে গঠিত। সেই কারণেই তাঁর রাষ্ট্র-ভাবনায় কেন্দ্রীভূত একরূপতার পরিবর্তে সাংস্কৃতিক সংহতির ধারণা অধিক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

এই দৃষ্টিভঙ্গি শ্রী অরবিন্দের ভারত-চিন্তার সঙ্গে গভীরভাবে সাযুজ্যপূর্ণ। শ্রী অরবিন্দ জাতিকে কেবল রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করেননি; তাঁর কাছে জাতি ছিল এক জীবন্ত সাংস্কৃতিক সত্তা, যার নিজস্ব আত্মা আছে, ইতিহাস আছে এবং একটি বিবর্তনশীল ভবিষ্যৎও আছে। শ্যামাপ্রসাদের রাষ্ট্র-ভাবনায়ও এই অন্তর্লীন ধারণার প্রতিধ্বনি শোনা যায়। ফলে জাতীয়তাবাদ তাঁর কাছে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাষা নয়, আত্মপরিচয়ের ভাষা; আধিপত্যের প্রকল্প নয়, সাংস্কৃতিক আত্মসচেতনতার প্রকাশ।

এই কারণেই তাঁর রাজনৈতিক দর্শনে অঞ্চল ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক প্রতিযোগিতার নয়, পরিপূরকতার। বঙ্গভূমি তাঁর কাছে কেবল জন্মভূমি নয়; ভারতীয় সভ্যতার এক উজ্জ্বল সাংস্কৃতিক পরিসর। আঞ্চলিক পরিচয় জাতীয় পরিচয়কে দুর্বল করে না; বরং তাকে সমৃদ্ধ করে। একটি সুস্থ রাষ্ট্র তখনই গড়ে ওঠে, যখন তার প্রতিটি অঞ্চল নিজস্ব ভাষা, সাহিত্য, ইতিহাস এবং সামাজিক শক্তিকে বিকশিত করার সুযোগ পায়। বৈচিত্র্যের ভিতরেই জাতীয় ঐক্যের শক্তি নিহিত—এই উপলব্ধি তাঁর রাষ্ট্রচিন্তার অন্যতম ভিত্তি।

এই ভাবনার মধ্যে পশ্চিমা জাতীয়তাবাদের প্রচলিত ধারণা থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য লক্ষ করা যায়। উনবিংশ ও বিংশ শতকের ইউরোপীয় জাতীয়তাবাদ প্রায়ই রাষ্ট্রকে শক্তি, সামরিক

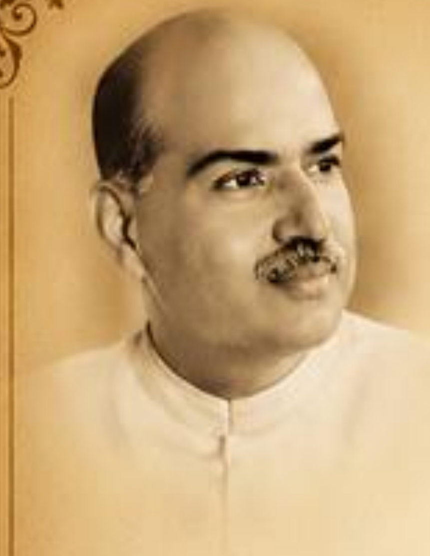

প্রতিযোগিতা এবং রাজনৈতিক আধিপত্যের পরিমাপে বিচার করেছিল। শ্যামাপ্রসাদের ভারত-ভাবনা সে পথে অগ্রসর হয় না। তাঁর দৃষ্টিতে ভারতের ঐতিহাসিক শক্তি নিহিত রয়েছে আত্মীকরণের ক্ষমতায়—বিভিন্ন ভাষা, বিশ্বাস, সম্প্রদায় ও সংস্কৃতিকে একটি বৃহত্তর সাংস্কৃতিক পরিসরে ধারণ করার সামর্থ্যে।

এই ঐক্য বাহ্যিক একরূপতা সৃষ্টি করে না; বরং পার্থক্যকে স্বীকার করেই একটি বৃহত্তর সভ্যতার চেতনায় তাদের যুক্ত করে।

রাষ্ট্র সম্পর্কে তাঁর এই উপলব্ধি শেষ পর্যন্ত শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং সমাজদর্শনের সঙ্গে এসে মিলিত হয়। কারণ কোনো জাতির স্থায়িত্ব কেবল তার সংবিধান বা প্রশাসনিক কাঠামোর উপর নির্ভর করে না; নির্ভর করে সেই জাতির মানুষের আত্মপরিচয় কতটা দৃঢ়, ইতিহাস সম্পর্কে তাদের বোধ কতটা গভীর এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাদের কল্পনা কতটা সৃজনশীল। এখানেই শ্যামাপ্রসাদের রাজনৈতিক চিন্তা এক বৃহত্তর সভ্যতার দর্শনে রূপান্তরিত হয়। রাষ্ট্র তখন আর কেবল শাসনের প্রতিষ্ঠান থাকে না; হয়ে ওঠে একটি সাংস্কৃতিক ও নৈতিক অভিযাত্রার ধারক।

এই কারণেই তাঁর চিন্তাজগৎকে কেবল রাজনৈতিক ইতিহাসের আলোয় পড়া যথেষ্ট নয়। রাষ্ট্র, শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং আধ্যাত্মিকতার মধ্যে তিনি যে সম্পর্ক অন্বেষণ করেছিলেন, তা ভারতীয় বৌদ্ধিক ইতিহাসের একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়। শ্রী অরবিন্দের দার্শনিক উত্তরাধিকারের সঙ্গে সেই অধ্যায়ের সংলাপ যত গভীরভাবে অনুধাবন করা যায়, ততই স্পষ্ট হয় যে স্বাধীন ভারতের নির্মাণ সম্পর্কে শ্যামাপ্রসাদের কল্পনা ছিল কেবল ক্ষমতার পরিবর্তনের পরিকল্পনা নয়; বরং মানুষের অন্তর্জগত থেকে জাতীয় জীবনের পুনর্গঠনের এক বৃহত্তর স্বপ্ন।

শ্যামাপ্রসাদের রাষ্ট্রচিন্তার স্বাভাবিক পরিণতি তাঁর শিক্ষাদর্শে এসে ধরা পড়ে। শিক্ষা তাঁর কাছে কেবল পেশা অর্জনের উপায় নয়; জাতির আত্মপরিচয় নির্মাণের প্রধান মাধ্যম। ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন এই কারণে যে, তা ভারতীয় সমাজকে

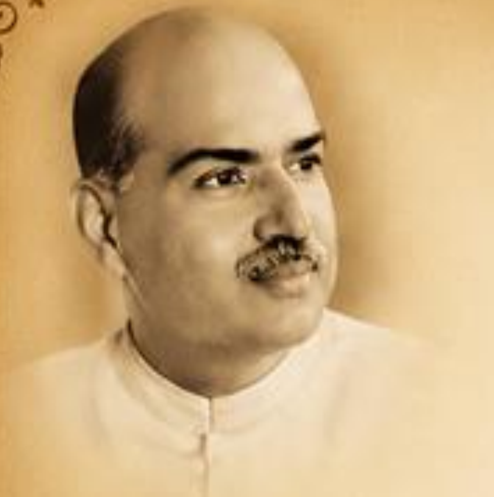

তার নিজস্ব ঐতিহ্য, ইতিহাস ও সাংস্কৃতিক স্মৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে তুলেছিল। এর বিপরীতে তিনি এমন এক শিক্ষার স্বপ্ন দেখেছিলেন, যেখানে স্থানীয় বাস্তবতার সঙ্গে জাতীয় চেতনা এবং বিশ্বমানবতার দৃষ্টিভঙ্গির সৃজনশীল সমন্বয় ঘটবে।

এই ধারণা শ্রী অরবিন্দের জাতীয় শিক্ষার দর্শনের সঙ্গে গভীর সাদৃশ্য বহন করে। উভয়ের কাছেই শিক্ষা ছিল মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশ এবং সমাজের নৈতিক পুনর্গঠনের একটি অবিচ্ছেদ্য প্রক্রিয়া।

একইভাবে সংস্কৃতি সম্পর্কেও শ্যামাপ্রসাদের ভাবনা কেবল শিল্প, সাহিত্য বা ঐতিহ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। সংস্কৃতি ছিল মানুষের মূল্যবোধ, সৃজনশীলতা এবং সামাজিক আচরণের সম্মিলিত প্রকাশ। এই উপলব্ধি তাঁকে শ্রী অরবিন্দের সেই ধারণার কাছাকাছি নিয়ে যায়, যেখানে জাতীয় সংস্কৃতির গভীরে মানুষের আত্মিক আকাঙ্ক্ষা, বৌদ্ধিক সৃজনশীলতা এবং সামাজিক জীবন পরস্পরকে ধারণ করে। স্বাধীনতার পরে ভারত যদি কেবল অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে এগোয় অথচ তার নৈতিক ও সাংস্কৃতিক ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়ে, তবে সেই অগ্রগতি দীর্ঘস্থায়ী হবে না—শ্যামাপ্রসাদের চিন্তায় এই উদ্বেগ স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়।

শ্যামাপ্রসাদের কাছে শ্রী অরবিন্দের গুরুত্ব কেবল একজন বিপ্লবী নেতা বা দার্শনিক হিসেবে নয়, বরং এমন এক ব্যক্তিত্ব হিসেবে, যাঁর জীবনে রাজনৈতিক সংগ্রাম ও আধ্যাত্মিক সাধনা এক অভিন্ন ধারায় মিলিত হয়েছিল। আলিপুর কারাবাসের অভিজ্ঞতার পর শ্রী অরবিন্দ যে অন্তর্মুখী যাত্রা শুরু করেন, তা তাঁর রাজনৈতিক কর্মধারাকে অস্বীকার করেনি; বরং তাকে একটি বৃহত্তর মানবিক ও আধ্যাত্মিক পরিসরে স্থাপন করেছিল। শ্যামাপ্রসাদের দৃষ্টিতে এই রূপান্তর ভারতীয় চিন্তার এক মৌলিক বৈশিষ্ট্যকে প্রকাশ করে—বাহ্যিক স্বাধীনতা এবং অন্তরের মুক্তি একে অপরের পরিপূরক।

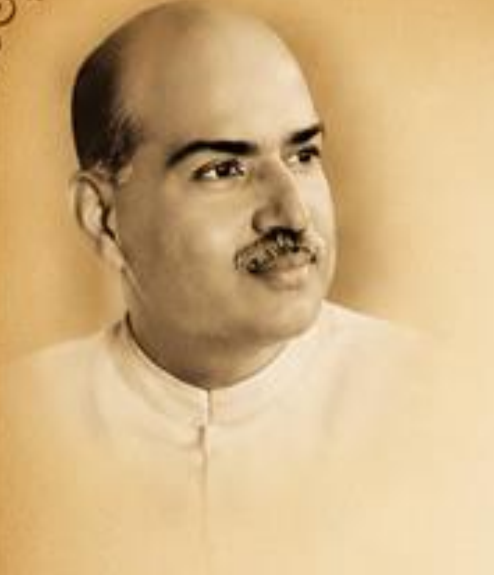

এই কারণেই শ্রী অরবিন্দ তাঁর কাছে অতীতের কোনো স্মারক নন; তিনি ছিলেন ভবিষ্যতের ভারত নির্মাণের এক বৌদ্ধিক ও নৈতিক প্রেরণা। পণ্ডিচেরিতে শ্রী অরবিন্দের স্মৃতিকে কেন্দ্র করে আন্তর্জাতিক শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠার উদ্যোগে তাঁর সক্রিয় ভূমিকা এই উপলব্ধিরই বাস্তব প্রকাশ। এখানে স্মৃতির চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল আদর্শের প্রাতিষ্ঠানিক রূপায়ণ।

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের চিন্তাকে কেবল সমকালীন রাজনৈতিক বিতর্কের আলোকে বিচার করলে তার গভীরতা অধরা থেকে যায়। রাষ্ট্র, শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে তাঁর ভাবনা মূলত ভারতীয় সভ্যতার আত্মপরিচয় পুনরাবিষ্কারের একটি প্রকল্প। এই প্রকল্পে শ্রী অরবিন্দের প্রভাব অনুসরণের নয়, বরং এক গভীর বৌদ্ধিক সংলাপের। উভয়ের চিন্তায় ভারত একটি ভূখণ্ডের নামমাত্র নয়; এটি একটি জীবন্ত সাংস্কৃতিক সত্তা, যার শক্তি বহুত্বের মধ্যে নিহিত ঐক্যে এবং যার ভবিষ্যৎ নির্ভর করে মানুষের অন্তর্জাগতিক বিকাশের উপর। তাই শ্যামাপ্রসাদের ভারত-ভাবনাকে বুঝতে গেলে তাঁর রাজনৈতিক কর্মজীবনের পাশাপাশি সেই দার্শনিক ভিত্তিকেও অনুধাবন করতে হয়, যেখানে জাতীয় পুনর্জাগরণ, সাংস্কৃতিক আত্মবিশ্বাস এবং আধ্যাত্মিক মানবতাবাদ পরস্পরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। একবিংশ শতকের ভারতেও এই ভাবনার প্রাসঙ্গিকতা এখানেই—রাষ্ট্রের শক্তি শেষ পর্যন্ত তার মানুষের নৈতিক ও সাংস্কৃতিক শক্তির উপরেই প্রতিষ্ঠিত।

তথ্যসূত্র (Bibliography & Sources):

- Ganguly, Anirban and Singh, Avadhesh Kumar (eds.).*Syama Prasad Mookerjee: His Vision of Education*, New Delhi: Wisdom Tree in association with Dr Syama Prasad Mookerjee Research Foundation (SPMRF), 2017.

- Mookerjee, Syama Prasad.*Educational Speeches* (With Foreword by Dr. Sarvepalli Radhakrishnan), Kolkata: A. Mukherjee & Co. (Private) Ltd., 1959.
- Mookerjee, Syama Prasad.*A Phase of Indian Struggle*, Kushtia: M.V. Bhowmick, 1942.
- Mookerjee, Syama Prasad. *Leaves from A Diary*, New Delhi: Oxford University Press, 1992 (Second edition edited by Dr. Reena Bhaduri, 2015).
- Ray, Tathagata. *Life and Times of Dr Syama Prasad Mookerjee: A Complete Biography*, New Delhi: Prabhat Prakashan, 2012.
- Vijay, Tarun (ed.). *Ameya Maitryee: Rabindranath Tagore & Syama Prasad*, New Delhi: Dr Syama Prasad Mookerjee Research Foundation, 2012.

"It has often been asserted that the polytheistic Hindu failed to establish a spiritual kinship with the monotheistic Muslim who held much that is Indian in scorn and still seeks his spiritual inspiration abroad. How can we say that India ignored the teachings of Islam when we find saints like Nanak and Chaitanya, Namdev and Tukaram, preaching the brotherhood of man and the futility of caste in matters spiritual? Although attempts on Hindu culture and institutions fill the pages of Indian history, how can we assert that Muslims ignored the appeal of Hindu culture when we find Muhammad Jayasi weaving a beautiful romance to illustrate the teachings of Hindu philosophy, when we read the simple devotional hymns of Kabir and Sheikh Farid, who refused to recognise the barriers of caste and creed on the high road to God's kingdom? "Utter not one disagreeable word," said Farid, "since the true lord is in all men. Distress no one's heart for every heart is a precious jewel." In the same strain did Kabir proclaim, "There is the same God for the Hindu as for the Muslim." A rejuvenated India found an Akbar to put an end to political chaos and social disharmony and a Shah Jahan to dream a dream in marble the like of which is not to be met in the world."

- *Speech delivered at Patna University Convocation on 27th November 1937.*

সত্তা ও স্মরণে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

ডঃ নন্দ কুমার পাখিড়া
স্টেট এইডেড কলেজ টিচার, বাংলা বিভাগ
কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম মহাবিদ্যালয়

ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাসে এক উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বের নাম ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। তিনি ছিলেন একজন শিক্ষাবিদ, আইনজ্ঞ, দক্ষ সংগঠক, দেশপ্রেমিক ও একজন ভবিষ্যৎদ্রষ্টা রাষ্ট্রনায়ক। তিনি আমাদের কাছে পরিচিত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা নায়ক হিসেবে। তাঁর প্রসঙ্গে আলোচনা মানেই ভারতবর্ষের একটি যুগের ইতিহাসকে তুলে ধরা; একটি আত্মত্যাগের কাহিনীকে সন্ধান করা। দেশের ঐক্য ও অখণ্ডতা রক্ষার সংগ্রামে তাঁর অবদান ভারতের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে।

ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ১৯০১ খ্রিস্টাব্দের ৬ই জুলাই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের কলকাতায় এক সম্ভ্রান্ত হিন্দু পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন “বাংলার বাঘ” খ্যাত স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, যিনি কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে সুনাম অর্জন করেন। মাতা ছিলেন যোগমায়া দেবী। পিতার মহান আদর্শ ও মায়ের অকুণ্ঠ স্নেহ—এই দুইয়ের মেলবন্ধনে তৈরি হয়েছিল শ্যামাপ্রসাদের মানস-ভূমি। পারিবারিক পরিবেশই তাঁর মধ্যে গভীর জাতীয়তাবাদের বীজ রোপণ করেছিল। পরবর্তীকালে যা তাঁকে শুধু একজন যুগপ্রবর্তক হিসেবেই নয়, একজন বিরল ব্যক্তিত্বের অধিকারী হিসেবেও তাঁকে গড়ে তোলে। আর সেই চেতনা থেকেই স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষকে একটি ঐক্যবদ্ধ জাতি হিসেবে গড়ে তোলার স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন।

ছোটবেলা থেকেই শ্যামাপ্রসাদ ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী। পরবর্তীকালে স্কুলের পড়াশোনা শেষ করে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯২১ সালে ইংরেজি সাহিত্যে বিএ (অনার্স) পরীক্ষায় সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে উত্তীর্ণ হন। এরপর বাংলা সাহিত্যে এম এ (১৯২৩ খ্রীঃ) এবং আইনের বি.এল. ডিগ্রিও লাভ করেন।

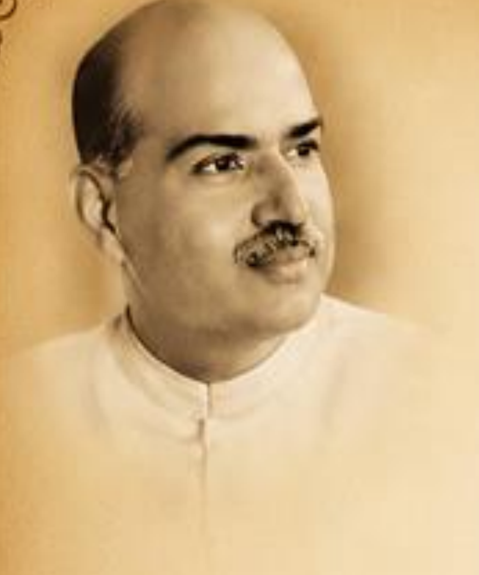

পরবর্তীকালে ১৯২৬ সালে ইংল্যান্ডের লিঙ্কনস ইন (Lincoln's Inn) থেকে বার-অ্যাট-ল (Bar-at-Law) যোগ্যতা লাভ করে ব্যারিস্টার হন। মাত্র ৩৩ বছর বয়সে, ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে, তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বকনিষ্ঠ উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

তাঁর পিতা উপাচার্য হিসেবে শিক্ষার যে আলো জ্বেলেছিলেন, তাঁরই সুযোগ্য উত্তরসূরি হিসেবে প্রায় দুই দশক ধরে শ্যামাপ্রসাদ বাংলা শিক্ষা ব্যবস্থার আধুনিকীকরণে ব্রতী হয়েছিলেন। তাঁরই উদ্যোগে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বাংলা ভাষার মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে তাঁর নেতৃত্বেই প্রথমবার বাংলা ভাষায় বক্তৃতা দেওয়া হয়।

আইনসভার সদস্য হিসেবে ১৯২৯ সালে তাঁর রাজনৈতিক জীবনের সূচনা হয়। প্রথমবার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা আইনসভায় নির্বাচিত হন। পরে জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত হন। কিন্তু মতভেদের কারণে এক বছর পরে তিনি দল থেকে পদত্যাগ করেন। ১৯৩৭ সালে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে জয়লাভ করে বাংলার বিরোধী দলনেতা হন।

পরে নিজের রাজনৈতিক প্রভাব দ্বারা কৃষক প্রজা পার্টির ফজলুল হকের সঙ্গে ১৯৪১ সালে জোট সরকার গঠন করেন এবং এই সরকারের রাজ্যের অর্থমন্ত্রী নিযুক্ত হন। ১৯৪৩ সালে তিনি হিন্দু মহাসভার সভাপতি নির্বাচিত হন। সেই সময় থেকেই তাঁর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি আরও পরিষ্কার হতে থাকে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তিনি জওহরলাল নেহরুর মন্ত্রিসভায় ভারতের প্রথম শিল্প ও সরবরাহমন্ত্রী হিসেবে যোগদান করেন। কিন্তু পাকিস্তান-ইস্যুকে কেন্দ্র করে “নেহরু-লিয়াকত চুক্তি” নিয়ে মতবিরোধ চরমে পৌঁছায়। শ্যামাপ্রসাদ মনে করতেন যে, এই চুক্তি পাকিস্তানে নির্যাতিত হিন্দুদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা ছাড়া আর কিছু নয়। তাই ১৯৫০ সালের ৬ই এপ্রিল তিনি মন্ত্রিত্ব থেকে পদত্যাগ করেন।

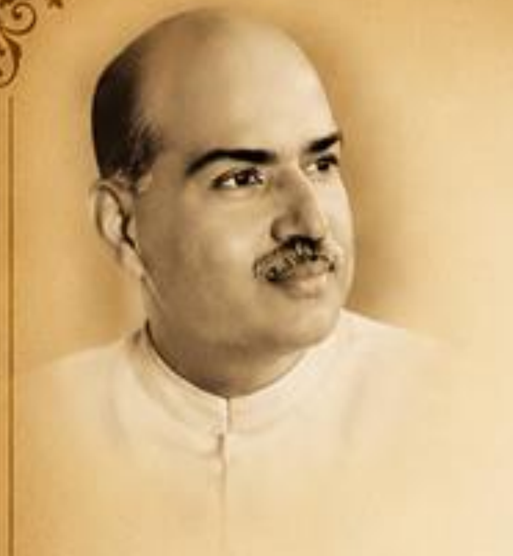

পরের বছর, ১৯৫১ সালের ২১শে অক্টোবর, শ্যামাপ্রসাদ আরএসএস-এর সাহায্যে 'ভারতীয় জনসংঘ' প্রতিষ্ঠা করেন, যা আজকের 'ভারতীয় জনতা পার্টি'র পূর্বসূরি। এই দল তৈরির পিছনে তাঁর একটাই লক্ষ্য ছিল—"এক দেশ, এক বিধান, এক নিশান, এক প্রধান।" তিনি ভারতের সংসদে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, "আমি কোনো দলের মানুষ নই, আমি ভারতের মানুষ, আমার কাছে ভারতমাতার স্বার্থই সর্বোচ্চ; দল, পদ, প্রতিষ্ঠা, সবকিছু তার নিচে।"

ক্ষমতার লোভ তাঁকে কখনো বাঁধতে পারেনি। তিনি মনে করতেন, আদর্শ থেকে বিচ্যুত হওয়া মৃত্যুর চেয়েও ভয়ংকর। জনসংঘের মধ্য দিয়ে তিনি দেশের সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছাতে চেয়েছিলেন।

১৯৪২ সালে গান্ধীজি যখন 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের ডাক দেন, তখন ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ব্রিটিশ সরকারের কাছে চিঠি লিখে এই গণআন্দোলনটি প্রতিহত করার ব্যাপারে মত প্রকাশ করেন। তাঁর মতে, এই চরম মহাযুদ্ধের (দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ) পরিস্থিতিতে গণআন্দোলন দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে দুর্বল করতে পারে। 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের সময় বাংলায় মুসলিম লীগ–কংগ্রেস বিরোধের প্রেক্ষাপটে তাঁর ভূমিকা তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি মনে করেছিলেন, ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রামের পাশাপাশি হিন্দু জাতির স্বার্থরক্ষাও সমান গুরুত্বপূর্ণ।

১৯৪৩ সালের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষে তিনি সাধারণ মানুষের সেবার জন্য পথে নেমে ত্রাণকার্যে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের সংকটময় সময়ে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক উদ্যোগ ও দৃঢ় নেতৃত্বের কারণে হিন্দু-অধ্যুষিত অঞ্চলগুলি নিয়ে 'পশ্চিমবঙ্গ' রাজ্যের সৃষ্টি সম্ভব হয়।

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে উপমহাদেশের রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্বের প্রশ্ন ও পরবর্তী কালে 'দ্বিজাতি তত্ত্ব'-এর ভিত্তিতে শক্তিশালী হতে থাকে। ঐতিহাসিক শিমলা

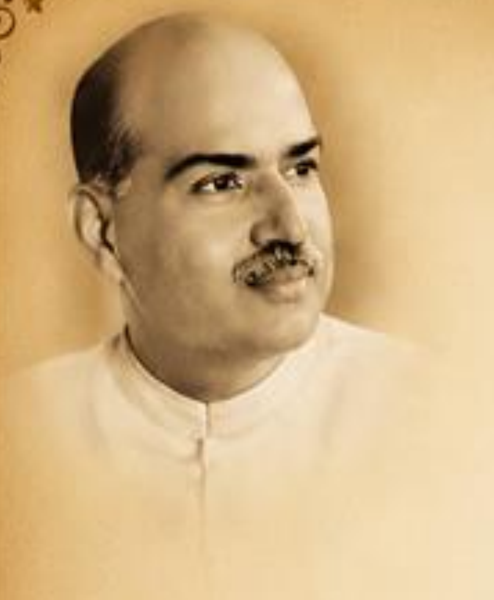

ডেপুটেশনের কিছুদিনের মধ্যেই ১৯০৬ সালে ঢাকায় ‘অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ’ এর প্রতিষ্ঠা ঘটে। মুসলিম লীগ মুসলমানদের রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নকে কেন্দ্রীয় ইস্যুতে পরিণত করে। স্বাধীনতার প্রাক্কালে, ১৯৪০-এর দশকে বাংলার রাজনৈতিক পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে ওঠে।

মুসলিম লীগ পাকিস্তান দাবিকে সামনে এনে রাজনৈতিক আন্দোলনকে তীব্র করে তোলে। ১৯৪৬ সালের ১৬ই আগস্ট ঘোষিত ‘ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে’-এর পর কলকাতায় ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে। অগ্নিসংযোগ, লুটপাট, ধর্ষণ, হত্যার মতো বিভিন্ন ঘটনার বিবরণ ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ রয়েছে।

এই সময় গোপাল মুখোপাধ্যায় (ওরফে ‘গোপাল পাঁঠা’) হিন্দুদের রক্ষার জন্য নিজের প্রাণ বাজি রেখে রাস্তায় নামেন। কলকাতার ঘটনার মাস দুয়েক পরেই হিন্দু-প্রধান নোয়াখালিতে সাম্প্রদায়িক হিংসাত্মক ঘটনা ঘটতে থাকে। নারীদের উপর নির্যাতন, ধর্ষণ, প্রাণহানি, বাস্তুচ্যুতির মতো ঘটনার কথা উঠে আসে জনসমক্ষে। বাংলার এই ঘটনাক্রম সাধারণ মানুষের মানসিকতা ও রাজনৈতিক অবস্থানকে গভীরভাবে নাড়িয়ে দেয়। এই সংকটকালে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গ গঠনের ডাক দিলেন।

স্বাধীনতা সংগ্রামে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হলো ভারত-ভাগ এর বিরুদ্ধে তথা বাংলা-ভাগের বিরুদ্ধে তাঁর অবস্থান। তিনি এটা মনে করতেন যে, অখণ্ড ভারত থেকে বাংলা যদি পৃথক হয়, তবে অন্তত হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশকে রক্ষা করা না গেলে পূর্ববঙ্গের হিন্দুরা সম্পূর্ণ অসহায় হয়ে পড়বে। তিনি বলেছিলেন, "যদি দেশভাগ হয়ই, তবে বাংলাও ভাগ হোক। পাকিস্তানে হিন্দুদের থাকার কোনো উপায় নেই। পশ্চিমবঙ্গ যেন ভারতের অংশ থাকে—এটাই আমার একমাত্র দাবি।" (১৯৪৭)

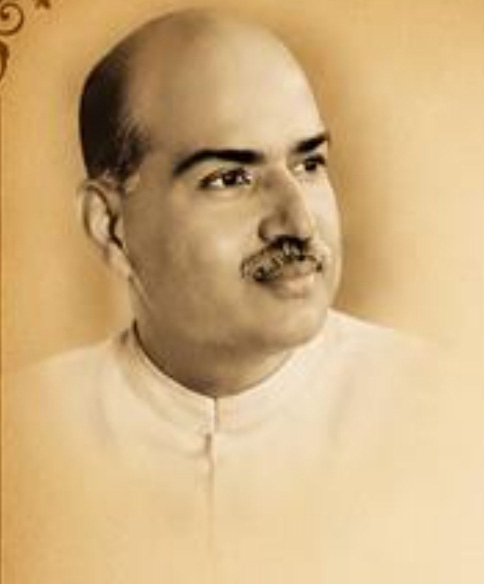

যখন তিনি দেখলেন যে আর কোনোভাবেই ভারতভাগ আটকানো গেল না, তখন প্রাণপণে লড়াই করেছিলেন যাতে অন্ততপক্ষে বাংলার হিন্দু-সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলগুলি ভারতের অন্তর্ভুক্ত থাকে। বর্তমান হুগলি জেলার অন্তর্গত তারকেশ্বরের রাজবাড়ির মাঠে অনুষ্ঠিত হিন্দু মহাসভার সম্মেলন (৪-৬ ই এপ্রিল, ১৯৪৭) থেকে তিনি পশ্চিমবঙ্গ গঠনের ডাক দিয়েছিলেন এবং বাংলাভাগের দাবিতে সোচ্চার হয়েছিলেন।

১৯৪৭ সালের ২০শে জুন বাংলা বিধানসভায় বাংলাভাগের প্রস্তাব পাশ হয় এবং পশ্চিমবঙ্গ নামক ভূখণ্ড ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে রক্ষা পায়। সেদিন ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় না থাকলে হয়তো আজকের পশ্চিমবঙ্গ পাকিস্তানের অংশ হয়ে যেত। তাই পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নাম অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে তাঁর অদম্য লড়াইয়ের জন্য।

ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কাশ্মীরকেও ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে প্রতিষ্ঠার দাবিতে আজীবন লড়াই করেছেন। তিনি কাশ্মীরে প্রবেশের জন্য "পারমিট সিস্টেম"-এর বিরোধিতা করেন। সংবিধানের ৩৭০ নং ধারার তিনি প্রবল বিরোধী ছিলেন। এক দেশে দুই বিধান কেন থাকবে—এই প্রশ্ন তিনি তুলেছিলেন। এই পারমিট প্রথার প্রতিবাদে তিনি ১৯৫৩ সালের মে মাসে কাশ্মীরে প্রবেশ করেন। তাঁকে সীমান্তে গ্রেপ্তার করা হয় এবং কোনো রকম অভিযোগ নামা ছাড়াই কারাবন্দি করে রাখা হয়। কোনো বিচার নেই, কেবল বন্দিত্ব। এই বন্দি দশায় তাঁর স্বাস্থ্যের অবনতি হতে থাকে। ১৯৫৩ সালের ২৩শে জুন, মাত্র ৫২ বছর বয়সে বন্দি দশায় তাঁর মৃত্যু হয়, যা আজও রহস্যাবৃত। তাঁর মৃত্যুর কোনো তদন্ত আজও হয়নি।

ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কেবল রাজনীতিবিদই নন, তিনি ছিলেন একজন সুশীল লেখক ও চিন্তাবিদ। ভারতীয় রাজনীতি ও সমাজ সম্পর্কে বিভিন্ন প্রবন্ধগ্রন্থ তিনি লিখেছিলেন। তার মধ্যে "আমার চিন্তা ও কর্ম", "রাষ্ট্র ও সংস্কৃতি" গ্রন্থে ভারতীয় সংস্কৃতির শিকড়ের সন্ধান

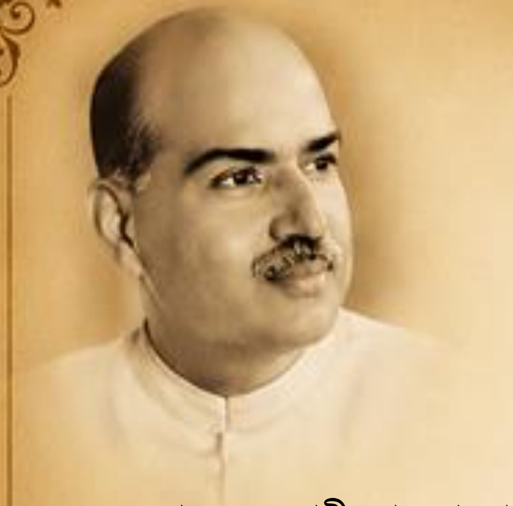

করেছেন। তাঁর আত্মজীবনীমূলক রচনা "Leaves from a Diary" উল্লেখযোগ্য একটি গ্রন্থ। এছাড়া "Education in British India" শীর্ষক গ্রন্থ এবং "A Phase of the Indian Struggle" গ্রন্থ ব্রিটিশরা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিল।

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে, পরাধীন ভারতে ও স্বাধীন ভারতের রাজনীতিতে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ভূমিকা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। বিভিন্ন আন্দোলনে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যুক্ত থাকা বা কোথাও কৌশলগত ভাবে বিরোধিতা করা তাঁর বহুমাত্রিক রাজনৈতিক প্রতিভার পরিচয়ক। মূলত তাঁর রাজনৈতিক পথযাত্রা বাঙালি হিন্দুত্ব রক্ষা ও অখণ্ড ভারতের আদর্শের উপরে প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাঁর উত্তরাধিকার শুধু রাজনৈতিক নয়; সাংস্কৃতিক, শিক্ষামূলক এবং আদর্শগত। ভারতবর্ষের ইতিহাসে জাতীয় চেতনা ও আত্মমর্যাদার এক উজ্জ্বল প্রতীক ভারতকেশরী ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। তাঁর মতো দেশপ্রেমিক, আত্মত্যাগী এবং দৃঢ়চেতা নেতৃত্ব আজও নতুন প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করে।

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়: শিক্ষা, মাতৃভাষা ও জাতীয় সংস্কৃতির অগ্রদূত

অধ্যাপক ডঃ সেক আবুল
সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ
কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম মহাবিদ্যালয়

ভারতের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও জাতীয় চেতনাকে সমৃদ্ধ করার ক্ষেত্রে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের অবদান অনস্বীকার্য। তিনি শুধু একজন রাজনীতিবিদ ছিলেন না, একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, চিন্তাবিদ ও সমাজসংস্কারকও ছিলেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল, একটি জাতির প্রকৃত উন্নতি সম্ভব কেবল শিক্ষার প্রসার, মাতৃভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠা এবং সাহিত্যচর্চার মাধ্যমে। তিনি মনে করতেন, শিক্ষা মানুষের মধ্যে জ্ঞান, আত্মবিশ্বাস ও জাতীয় চেতনার বিকাশ ঘটায় এবং সাহিত্য মানুষকে মানুষে, জাতিকে জাতির সঙ্গে একসূত্রে বেঁধে দেয়। তাই তিনি শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে জাতীয় উন্নয়নের প্রধান ভিত্তি হিসেবে দেখেছিলেন।

১। সাহিত্য ও জাতীয় জীবনে তার গুরুত্ব -

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মনে করতেন, সাহিত্যের মূল উদ্দেশ্য হলো মানুষকে একে অপরের সঙ্গে যুক্ত করা। সাহিত্য মানুষের মনের অন্ধকার দূর করে, সংকীর্ণতা ভাঙে এবং অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের মধ্যে সেতুবন্ধন তৈরি করে। যে জাতির নিজস্ব সাহিত্য নেই, সেই জাতি নিজের পরিচয়ও হারিয়ে ফেলে। বহু প্রতিকূলতার মধ্যেও বাংলা সাহিত্য বাঙালি জাতিকে তার আত্মপরিচয় ও সাংস্কৃতিক শক্তি ধরে রাখতে সাহায্য করেছে। তাঁর মতে, সাহিত্যের কারণেই বাঙালি তার প্রাণশক্তি, আত্মমর্যাদা ও জাতীয় চেতনাকে আজও অটুট রাখতে পেরেছে।

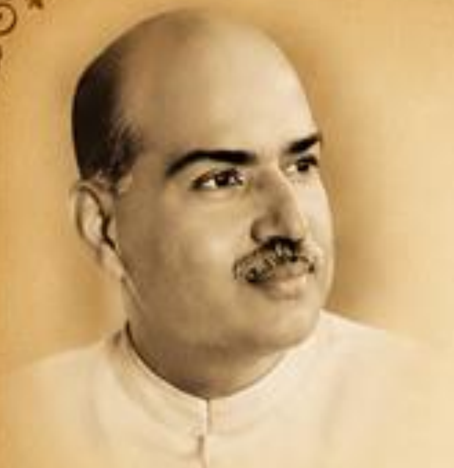

২। বাংলা সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য -

বাংলা সাহিত্যের দীর্ঘ ইতিহাসের প্রতি শ্যামাপ্রসাদ গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করতেন। তিনি মনে করতেন, বাংলা সাহিত্যের ধারাবাহিকতা আমাদের পূর্বপুরুষদের সঙ্গে মানসিক সম্পর্ক বজায় রেখেছে। যুগে যুগে নানা সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তন এলেও সাহিত্য জাতির সংস্কৃতিকে জীবন্ত রেখেছে।

কিছু কুসংস্কার ও অজ্ঞতা সাহিত্যের বিকাশে বাধা সৃষ্টি করলেও মানুষের সচেতনতা সেই বাধা দূর করতে পারে। তাঁর মতে, সাহিত্যই জাতীয় সংস্কৃতির সবচেয়ে শক্তিশালী বাহক।

৩। মাতৃভাষায় শিক্ষার গুরুত্ব -

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের অন্যতম বড় অবদান ছিল মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার প্রসারে তাঁর নিরন্তর প্রচেষ্টা। তিনি মনে করতেন, মাতৃভাষায় শিক্ষা গ্রহণ করলে জ্ঞান সহজে আত্মস্থ হয় এবং চিন্তাশক্তির বিকাশ ঘটে। ইংরেজি শিক্ষার প্রথম যুগে অনেক শিক্ষিত মানুষ মাতৃভাষাকে অবহেলা করলেও তিনি সেই মানসিকতার বিরোধিতা করেছিলেন। তাঁর প্রচেষ্টায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উচ্চশিক্ষার সুযোগ বিস্তৃত হয় এবং মাতৃভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে ভারতের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ও এই আদর্শ অনুসরণ করে।

৪। বহুভাষিক শিক্ষা ও জাতীয় সংহতি -

নিজের ভাষাকে ভালোবাসার পাশাপাশি অন্য ভারতীয় ভাষার প্রতিও শ্রদ্ধাশীল হওয়ার শিক্ষা দিয়েছিলেন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। তাঁর উদ্যোগে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে বাংলা ছাড়াও হিন্দি, মারাঠি, গুজরাটি, ওড়িয়া, অসমিয়া, মৈথিলী, তামিল ও তেলুগু ভাষা অন্তর্ভুক্ত হয়। তিনি বিশ্বাস করতেন, বিভিন্ন ভাষার চর্চা ভারতের সাংস্কৃতিক ঐক্যকে আরও শক্তিশালী

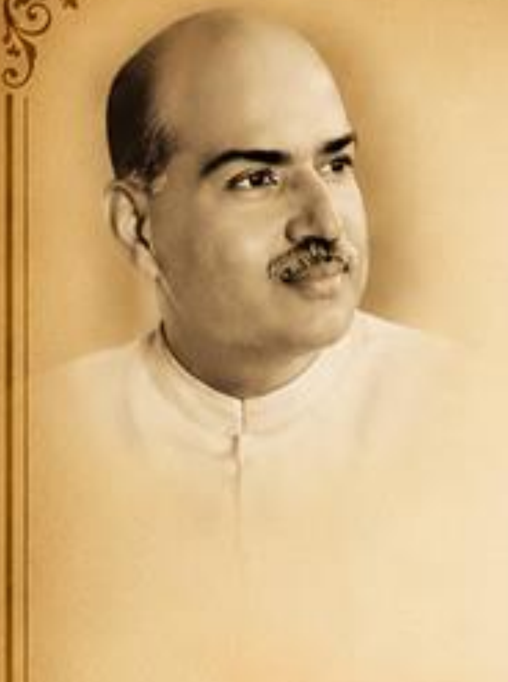

করবে। তাঁর মতে, দেশের প্রতিটি ভাষা ও সংস্কৃতির উন্নতির মধ্য দিয়েই সমগ্র ভারতের অগ্রগতি সম্ভব।

৫। মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষার আহ্বান -

শ্যামাপ্রসাদ মনে করতেন, ভাষা ও সাহিত্য একে অপরের পরিপূরক। যে ব্যক্তি নিজের ভাষাকে ভালোবাসে, সে নিজের সাহিত্যকেও ভালোবাসে।

তিনি কখনো অন্য ভাষা শেখার বিরোধিতা করেননি; বরং বলেছিলেন, নিজের মাতৃভাষা আয়ত্ত করার পর অন্য ভাষা শেখা উচিত। কিন্তু অন্য ভাষা শেখার কারণে যদি কেউ নিজের মাতৃভাষাকে ভুলে যায়, তবে তা জাতির জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। তিনি শিক্ষাকে কখনো রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করার বিরোধিতা করেছিলেন এবং ভাষার মাধ্যমে বিভেদ সৃষ্টি না করে ঐক্য প্রতিষ্ঠার ওপর জোর দিয়েছিলেন।

৬। বয়স্ক শিক্ষা ও ছাত্রসমাজের ভূমিকা -

দেশের নিরক্ষর জনগণকে শিক্ষিত করার জন্য শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তাঁর মতে, শিক্ষিত ছাত্রসমাজ যদি অবসর সময়ে গ্রামের নিরক্ষর মানুষদের পড়াশোনা শেখায়, তবে খুব দ্রুত শিক্ষার প্রসার সম্ভব। তিনি বয়স্ক শিক্ষার জন্য বিদ্যালয়, গ্রন্থাগার, সাহিত্যসমিতি ও বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। তাঁর বিশ্বাস ছিল, একজন মানুষ যদি অন্তত নিজের ভাষায় পড়তে ও লিখতে পারেন, তবে তিনি সমাজের সচেতন ও দায়িত্বশীল নাগরিক হয়ে উঠবেন।

শিক্ষা শুধু পরীক্ষার জন্য নয়শ্যামাপ্রসাদ মনে করতেন, প্রকৃত শিক্ষা শুধু পরীক্ষায় পাশ করার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। শিক্ষার উদ্দেশ্য হলো মানুষের জ্ঞান বৃদ্ধি, চিন্তার বিকাশ এবং সমাজ

সম্পর্কে সচেতন করে তোলা। তাই তিনি ব্যবহারিক ও জীবনমুখী শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন। বয়স্ক শিক্ষার ক্ষেত্রেও তিনি এমন পাঠ্যক্রমের কথা বলেছিলেন, যা শ্রমজীবী মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে এবং অল্প সময়ে কার্যকর জ্ঞান প্রদান করবে।

৭। জাতীয় ঐক্যে ভাষা ও সাহিত্যের ভূমিকা -

তিনি বিশ্বাস করতেন, ভারতের বিভিন্ন ভাষা ও সংস্কৃতি একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী নয়, বরং পরিপূরক। তাই এক ভাষার সাহিত্যকে অন্য ভাষার মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য তিনি অনুবাদের পাশাপাশি লিপ্যন্তরের ধারণাও সমর্থন করেছিলেন। তাঁর মতে, এতে ভারতের বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষ সহজে একে অপরের সাহিত্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হতে পারবেন। এই উদ্যোগ জাতীয় সংহতি আরও সুদৃঢ় করবে।

৮। রাজনৈতিক বিভেদের বিরুদ্ধে অবস্থান -

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ভাষা, ধর্ম বা প্রাদেশিকতার ভিত্তিতে বিভেদ সৃষ্টির বিরোধিতা করেছিলেন। তিনি মনে করতেন, শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের মধ্যে সচেতনতা তৈরি হলে বিভাজনের রাজনীতি সফল হতে পারবে না। তাঁর মতে, সাহিত্য ও শিক্ষা এমন এক উদার ক্ষেত্র, যেখানে সব মত ও পথের মানুষ মিলিত হতে পারে। তাই জাতীয় ঐক্য রক্ষার জন্য সর্বস্তরে শিক্ষার প্রসার অপরিহার্য।

ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের শিক্ষা-ভাবনা আজও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। তিনি এমন একটি ভারতের স্বপ্ন দেখেছিলেন, যেখানে প্রতিটি মানুষ শিক্ষিত হবে, মাতৃভাষা যথাযোগ্য মর্যাদা পাবে এবং বিভিন্ন ভাষা ও সংস্কৃতির মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠবে।

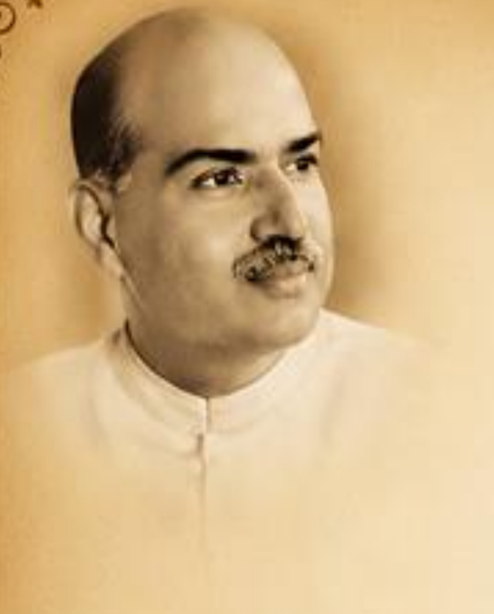

শিক্ষার আলো, মাতৃভাষার প্রতি ভালোবাসা, সাহিত্যচর্চা এবং জাতীয় সংহতির যে আদর্শ তিনি আমাদের সামনে রেখে গেছেন, তা আজও সমাজ গঠনের অন্যতম পথনির্দেশ। তাঁর চিন্তা ও কর্ম আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, শিক্ষিত, সচেতন ও ঐক্যবদ্ধ জাতিই একটি শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ ভারতের ভিত্তি।

"The very system of education which was deemed essential for forging bonds of unbroken alliance with the British power succeeded in unleashing revolutionary ideas and thoughts, which ultimately helped to throw off the yoke of alien rule in India. If we take a dispassionate view of what happened during the last one century, we must acknowledge that this has been an era in which good has been mixed with evil. The contact between the Indian mind and western thought and civilisation did not enslave the soul of India. In every domain of thought, in arts and architecture, in science, in history, philosophy and letters, in social services and in religious thought, great Indians gave their best, maintaining their stamp of originality as well as imbibing and assimilating fruits of western skill and knowledge. Though the number of Indians affected by such spread of knowledge was comparatively small, many of them assumed a much needed political leadership and became the instruments of agitation and mass movements, leading ultimately to the political liberation of their country. The cultural Renaissance preceded and created the silent Revolution."

Speech delivered at Delhi University Convocation on 13th December 1952. (Source: Educational Speeches by Dr. Shyamaprasad Mookerjee, 1959, A.Mukherjee & Co. (Private) Ltd., 2 College Square, Kolkata 700 012)

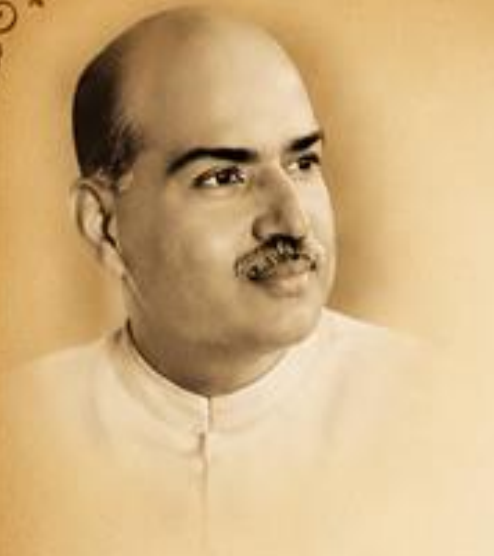

রাজনীতির নেপথ্যে এক ঋষিতুল্য ব্যক্তিত্ব: ড. শ্যামা প্রসাদ মুখোপাধ্যায়

ড. তন্ময় নায়েক
স্টেট এইডেড কলেজ টিচার, ইতিহাস বিভাগ
কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম মহাবিদ্যালয়

ভূমিকা:

পরাধীন ভারতবর্ষে এমন কিছু মহান ব্যক্তি রয়েছেন, যাঁদের ইতিহাস বা জন্মবৃত্তান্ত আশানুরূপ জনপ্রিয়তা পায়নি; কালের নিয়মে তা হয়তো হারিয়ে গেছে, কিংবা রাজনৈতিক চক্রান্ত ও ধর্মীয় ভেদাভেদে বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গেছে। কিন্তু ইতিহাসের কাজই হলো অতীতের অন্বেষণ। মাটির ধ্বংসস্তূপ থেকে যেমন প্রত্নবস্তু উদ্ধার করে ইতিহাসের উপাদান হিসেবে তুলে ধরা হয়, তেমনি হারিয়ে যাওয়া মহান পুরুষ ও নারীদের ইতিহাসকে সামনে নিয়ে আসাই ইতিহাসের প্রকৃত কাজ। প্রখ্যাত স্বাধীনতা সংগ্রামী দুকড়িবালা দেবীর ইতিহাস যেমন খুব বেশি চর্চিত হয় না, তেমনি ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের অবদান নিয়েও সেইভাবে আলোচনা হয় না। সাধারণ মানুষ অনেকেই তাঁর সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানেন না, কিংবা যা জানেন তা বিতর্কিত ইতিহাস। কিছু রাজনৈতিক দল, ব্যক্তি এবং ধর্মীয় সংগঠন তাঁর অনবদ্য সংগ্রাম ও কর্মপ্রচেষ্টাকে কালিমালিপ্ত করার চেষ্টা করলেও, তিনি ছিলেন একজন প্রখ্যাত ভারতীয় রাজনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ ও আইনজীবী। দেশপ্রেম, নেতৃত্বের দক্ষতা এবং জাতীয় স্বার্থ রক্ষার সংকল্প তাঁকে ভারতীয় ইতিহাসে এক বিশেষ মর্যাদা দিয়েছে। শিক্ষা, রাজনীতি ও সমাজসেবার বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁর অবদান আজও সমানভাবে স্মরণীয়।

জন্ম ও পারিবারিক জীবন: ১৯০১ সালের ৬ জুলাই ব্রিটিশ ভারতের কলকাতায় এক সম্ভ্রান্ত বাঙালি পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন 'বাংলার বাঘ' হিসেবে পরিচিত

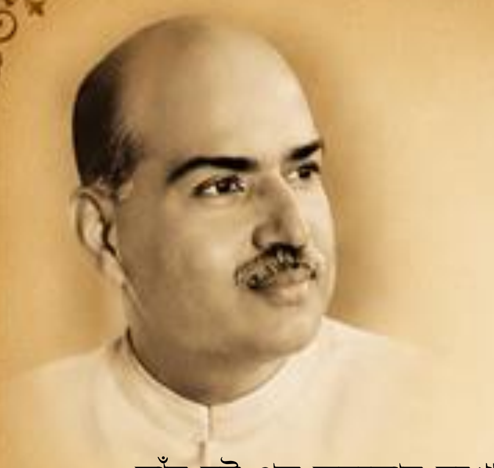

স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এবং মাতা শ্রীমতি যোগমায়া দেবী। ১৯২২ সালের ১৬ এপ্রিল: ড: বেণীমাধব চক্রবর্তীর কন্যা শ্রীমতী সুধা দেবীর সঙ্গে বিবাহ হয়। তাঁর পাঁচটি সন্তান থাকলেও এক সন্তান খুব অল্প বয়সে ডিপথেরিয়ায় মারা যায়। তাঁর দুই পুত্র অনুতোষ মুখোপাধ্যায় এবং দেবতোষ মুখোপাধ্যায়। তাঁর দুই কন্যা হলেন সবিতা মুখোপাধ্যায় ও আরতি মুখোপাধ্যায়।১৯৩৩ সালে তাঁর স্ত্রীর মৃত্যু হলে , তাঁর ভ্রাতৃবধূ, জাস্টিস রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের স্ত্রী তারা দেবী সন্তানদের নিজের সন্তানের মতো মানুষ করেন।তাঁর পিতা আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ছিলেন একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য।

শিক্ষা লাভ: ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ১৯১৭ সালে কলকাতার ভবানীপুরের মিত্র ইনস্টিটিউশন থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করেন। এরপর ১৯২১ সালে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ইংরেজি বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। পিতার অনুরোধে ১৯২৩ সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৯২৪ সালে একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি আইন বিষয়ে স্নাতক (Bachelor of Law) ডিগ্রি লাভ করেন। এখানেই তিনি থেমে থাকেননি; আইনশাস্ত্রে উচ্চশিক্ষার জন্য এরপর তিনি লন্ডন গমন করেন এবং ১৯২৭ সালে বিলেতের Lincoln's Inn থেকে ব্যারিস্টার-অ্যাট-ল (Barrister at Law) ডিগ্রি অর্জন করেন। পরিশেষে, ১৯৩৮ সালের ২৬শে নভেম্বর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানসূচক ডিলিট উপাধিতে ভূষিত করে।"

শিক্ষা জীবনের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য: তিনি ছিলেন অসাধারণ মেধার অধিকারী। আইন ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর গভীর জ্ঞান ছিল। ইংল্যান্ড থেকে আইন বিষয়ে শিক্ষা লাভ করার পর তিনি কলকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসা শুরু করেছিলেন। ১৯৩৪ সালে, মাত্র ৩৩ বছর বয়সে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিযুক্ত হন এবং ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। পরাধীন ভারতবর্ষে তথা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের শাসনকালে তিনি ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বকনিষ্ঠ উপাচার্য। তাঁর এই শিক্ষাগত ও প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা পরবর্তী জীবনে তাঁকে একজন সুবক্তা এবং দক্ষ রাজনীতিবিদ হিসেবে গড়ে তুলতে সাহায্য

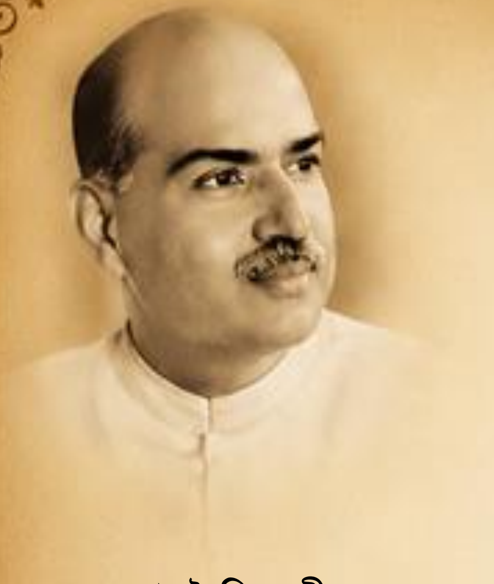

করেছিল। তাঁর উপাচার্য থাকাকালীন সময়ে, ১৯৩৭ সালের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথম বাংলায় ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। তাঁর অনুরোধেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'চল যাই, চল যাই' গানটি রচনা করেন, যা ছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সঙ্গীত।

রাজনৈতিক জীবন:

ক. প্রাক্ স্বাধীনতা পর্বের রাজনৈতিক জীবন (১৯২৯- ১৯৪৭ খ্রি :) :

১৯২৯ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি হিসেবে তিনি কংগ্রেসের সহযোগিতায় প্রথমবারের মতো বঙ্গীয় আইন পরিষদে নির্বাচিত হন। কিন্তু কংগ্রেসের সঙ্গে মতপার্থক্যের কারণে সেই বছরেই তিনি পদত্যাগ করেন। পরবর্তীতে নির্দলীয় প্রার্থী হিসেবে তিনি পুনরায় নির্বাচিত হন। কংগ্রেস ছাড়ার পর তিনি উপলব্ধি করেন যে, বাংলার শিক্ষা ও সামাজিক স্বার্থ রক্ষার জন্য আইনসভায় সক্রিয় থাকা জরুরি। তাই দলীয় সিদ্ধান্তের বাইরে গিয়ে তিনি স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচিত হন। ১৯৩৭ সালেও তিনি এই কেন্দ্র থেকে পুনরায় জয়লাভ করেন। ১৯৩৯ সালে বিনায়ক দামোদর সাভারকারের সাথে মতপার্থক্যের কারণে তিনি ওই বছরই আনুষ্ঠানিকভাবে "অখিল ভারত হিন্দু মহাসভায়" যোগদান করেন। ভারতের অখণ্ডতা রক্ষা এবং সাম্প্রদায়িক রাজনীতি মোকাবিলায় তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি বাংলা বিভাগের বিরুদ্ধে এবং বঙ্গীয় মুসলমানদের সাথে রাজনৈতিক সমঝোতার পরিবর্তে অখণ্ড ভারতের অস্তিত্ব রক্ষার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালের তিনি 'শের-ই-বাংলা' নামে খ্যাত এ. কে. ফজলুল হকের নেতৃত্বাধীন 'প্রগতিশীল কোয়ালিশন' মন্ত্রিসভায় বাংলার অর্থমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।কিন্ত ১৯৪২ সালে গান্ধীজির ডাকে ভারত ছাড়ো আন্দোলনে ব্রিটিশ সরকারের কঠোর দমন-নীতির সমালোচনা করেন।১৯৪৩ সালে ভয়াবহ 'পঞ্চাশের মন্বন্তরের' সময়ে তিনি 'বেঙ্গল রিলিফ কমিটি' গঠন করে লক্ষাধিক মানুষের প্রাণ বাঁচাতে ঝাপিয়ে পড়েন।

স্বাধীনতার প্রাক্কালে বাংলা: দাঙ্গা, বিভাজন ও পশ্চিমবঙ্গের জন্ম :

১৯৪০-এর দশকের পর থেকে বাংলার রাজনৈতিক পরিস্থিতি জটিল হয়ে ওঠে। ১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্ট মুসলিম লিগের 'ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে' পালনের পর কলকাতায় ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে। এই দাঙ্গার পর তিনি তিনি 'হিন্দুস্থান ন্যাশনাল গার্ড' গঠন করেন।

এই নৃশংস দাঙ্গায় প্রাণহানির সংখ্যা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ থাকলেও, পরিস্থিতি ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। এর দুই মাস পরই নোয়াখালিতে সাম্প্রদায়িক সহিংসতা শুরু হয়, যা পরিস্থিতিকে আরও অস্থির করে তোলে। এই দাঙ্গা বাংলার সাধারণ মানুষের মনস্তত্ত্ব ও রাজনৈতিক অবস্থানে গভীর প্রভাব ফেলে।

বাংলা বিভাজন ও রাজনৈতিক তৎপরতা:

স্বাধীনতার প্রাক্কালে বাংলা অখণ্ড থাকবে নাকি বিভক্ত হবে—এই প্রশ্নটি প্রধান হয়ে ওঠে। একদিকে ছিল 'ইউনাইটেড বেঙ্গল' বা অখণ্ড বাংলার ধারণা, অন্যদিকে হিন্দু-অধ্যুষিত অঞ্চলের মানুষের মধ্যে ভাষা, সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক ভবিষ্যতের নিরাপত্তা নিয়ে গভীর উদ্বেগ দেখা দেয়। এই প্রেক্ষাপটে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বঙ্গ বিভাজনের পক্ষে জনমত গড়ে তোলেন। সুচেতা কৃপালনীও অখণ্ড বাংলার প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করেন।

মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা ও ঐতিহাসিক ভোট:

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের বলিষ্ঠ রাজনৈতিক পদক্ষেপের ফলে ১৯৪৭ সালের 'থার্ড জুন প্ল্যান'-এ বাংলার ভবিষ্যৎ নির্ধারণের জন্য আইনসভার সদস্যদের ভোটের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ২০ জুন ১৯৪৭ সালে এই ঐতিহাসিক ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয় তিনটি ধাপে:

১. যৌথ অধিবেশন: বাংলা অখণ্ড থাকবে কি না—তা নিয়ে আলোচনা।

২. **মুসলিম-অধ্যুষিত অঞ্চল:** সদস্যরা পাকিস্তানে যোগ দেওয়ার এবং নতুন সংবিধান তৈরির পক্ষে মত দেন।

৩.**অমুসলিম/হিন্দু-অধ্যুষিত অঞ্চল:** ৫৮-২১ ভোটে সদস্যরা বাংলা বিভাজনের এবং ভারতের অংশ হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এই ভোটের ফলাফলের ভিত্তিতেই বাংলা বিভক্ত হয়।

পশ্চিমবঙ্গ ভারতের অংশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে এবং পূর্ববঙ্গ পূর্ব পাকিস্তানে পরিণত হয়। পশ্চিমবঙ্গের সৃষ্টি কেবল রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের ফসল নয়, এটি ছিল তৎকালীন মানুষের অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম ও ভবিষ্যৎ নির্মাণের এক জটিল ও রক্তাক্ত ইতিহাসের ফসল।

খ.ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর রাজনৈতিক জীবন (১৯৪৭- ১৯৫৩ খ্রিঃ) : ১৯৪৭ সালে ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর (১৯৪৭ -১৯৫০ খ্রিস্টাব্দ) ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ভারতের প্রথম শিল্প ও সরবরাহ মন্ত্রী ছিলেন। ১৯৪৮ সালে তিনি ভারতের প্রথম শিল্পনীতি প্রণয়ন করেন। ১৯৫০ সালে পূর্ব পাকিস্তানের হিন্দুদের ওপর অত্যাচারের প্রতিবাদে এবং জওহরলাল নেহরুর তোষণ নীতির সমালোচনা করে—বিশেষত ১৯৫০ সালের ৮ই এপ্রিল স্বাক্ষরিত 'নেহরু-লিয়াকত 'চুক্তির প্রতিবাদে—তিনি কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেন। মন্ত্রিসভা ত্যাগের পর ১৯৫১ সালের ২১শে অক্টোবর তিনি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের সহযোগিতায় ভারতীয় জনসংঘ গঠন করেন ও এর প্রথম জাতীয় সভাপতি হন। ১৯৫২ সালে ১৯৫২ সালের প্রথম লোকসভা নির্বাচনে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় 'কলকাতা দক্ষিণ-পূর্ব' (Calcutta South East) কেন্দ্র থেকে জয়ী হন। নির্বাচনের সরকারি ফলাফল অনুযায়ী, তিনি মোট **৬৫,০২৬** টি ভোট পেয়েছিলেন (যা মোট ভোটের প্রায় ৪৪.৯৭%)। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের মৃগাঙ্ক মোহন সুর, যিনি ৪৪,০৪৪ টি ভোট পেয়েছিলেন।এই হিসাবে ,ড: শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বীর চেয়ে ২০৯৮২ টি ভোটে জয়ী হয়েছিলেন। ১৯৫২-৫৩ সালে তিনি **'এক দেশে দুই প্রধান, দুই বিধান ও দুই নিশান চলতে পারে না'**—এই স্লোগানটি জনপ্রিয় করেন।

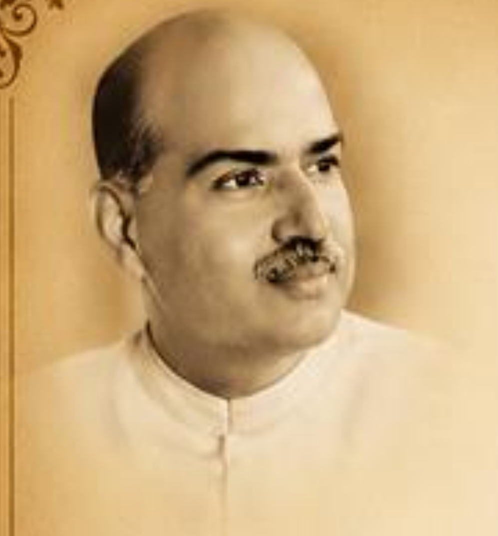

তিনি জম্মু-কাশ্মীরে প্রবেশের জন্য ভারত সরকারের অনুমতি নেওয়ার সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ১৯৫৩ সালের মে মাসে কাশ্মীরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। এর ফলে তাঁকে সেখানে গ্রেফতার করা হয় এবং শ্রীনগরের কারাগারে বন্দী থাকা অবস্থায় ১৯৫৩ সালের ২৩শে জুন তাঁর মৃত্যু হয়।

তৎকালীন 'যুগান্তর' পত্রিকা থেকে জানা যায় যে, ১৯৫৩ সালের ২৪শে জুন বুধবার, কেওড়াতলা শ্মশান ঘাটে পুরুষশ্রেষ্ঠ শ্যামাপ্রসাদের নশ্বর দেহ দুপুর ২টা ১৫ মিনিটে পঞ্চভূতে লীন হয়। জ্যেষ্ঠপুত্রের হস্তক্ষেপে মুখাগ্নি, প্রকৃতির অঝোর ধারাবর্ষণ এবং চিতানলে শান্তি-জল সিঞ্চনের মধ্য দিয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষের সমাগমে অশ্রুসজল চোখে শেষ বিদায় নিলেন আমাদের সকলের প্রিয় ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। তিনি আমাদের ছেড়ে চলে গেলেও তাঁর কর্মপদ্ধতি ও চিন্তাভাবনা পরবর্তী প্রজন্মকে আজও অনুপ্রাণিত করে ও ভাবাবেগে আপ্লুত করে।

সমাজ ভাবনা: ভারতের অখণ্ডতাকে তিনি কেবলমাত্র ভৌগোলিক নয়, বরং হাজার বছরের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের মিলনস্থল বলে মনে করতেন। ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগ যে দীর্ঘস্থায়ী বিভেদ ও সমস্যার সৃষ্টি করবে, তা তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন। মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাকে সামাজিক পরিবর্তনের প্রধান হাতিয়ার হিসেবে মনে করতেন এবং শিক্ষাকে তিনি সংকীর্ণ রাজনীতির ঊর্ধ্বে রাখতে চাইতেন। বিদেশি নির্ভরতা কাটিয়ে শিল্প ও অর্থনীতিতে ভারতকে স্বনির্ভর করে তোলাই ছিল তাঁর অর্থনৈতিক ও সামাজিক দর্শনের মূল লক্ষ্য।

মূল্যায়ন: সমালোচকদের দৃষ্টিতে, তিনি ধর্মীয় পরিচয়ের ভিত্তিতে মানচিত্র অঙ্কন করে পরোক্ষভাবে 'দ্বি-জাতি তত্ত্বকেই' বৈধতা দিয়েছিলেন, যা আধুনিক ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শের পরিপন্থী। অন্যদিকে, তাঁর সমর্থক ও ঐতিহাসিকদের একাংশের মতে, তিনি যদি সেই সময় সক্রিয় না হতেন, তবে সম্ভবত আজকের পশ্চিমবঙ্গের মানচিত্র ও তার ভৌগোলিক অস্তিত্ব হুমকির মুখে পড়ত।

তথ্য বিশ্লেষণ করলে এটি স্পষ্ট যে, বাংলা বিভাজন কোনো একক ব্যক্তির ইচ্ছায় হয়নি। এটি ছিল একটি দীর্ঘস্থায়ী দাঙ্গা, সামাজিক অবিশ্বাস এবং রাজনৈতিক নেতৃত্বের ব্যর্থতার সম্মিলিত ফলাফল।

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সেই অস্থির সময়ে একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক গোষ্ঠীর (হিন্দু-অধ্যুষিত অঞ্চল) নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য কাজ করেছেন। অর্থাৎ, তিনি **'ইতিহাসের নির্মাতা'** নাকি **'ইতিহাসের শিকার'**—এটি এক চিরকালীন তর্কের বিষয়। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ছিলেন একজন দূরদর্শী রাষ্ট্রনেতা, যিনি সবসময় দেশের জাতীয় স্বার্থকে দলীয় বা ব্যক্তিগত স্বার্থের ঊর্ধ্বে স্থান দিয়েছেন। তাঁর আত্মত্যাগ এবং চিন্তাধারা ভারতের অখণ্ডতা ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য রক্ষার ইতিহাসে চিরকাল অমর হয়ে থাকবে।

"Generally speaking, an Indian university must regard itself as one of the living organs of national reconstruction. It must discover the best means of blending together both the spiritual and the material aspects of life. It must equip its alumni irrespective of caste, creed or sex, with individual fitness, not for its own sake, not for merely adorning varied occupations and professions, but in order to teach them how to merge their individuality in the common cause of advancing the progress and prosperity of their motherland and upholding the highest traditions of human civilisation."

Speech delivered at Nagpur University Convocation on 5th December 1936.

The Bengal Famine and Dr. Shyama Prasad Mookerjee: Humanitarian Leadership in a Time of Catastrophe

Probhat Chandra Hazra
Assistant Professor of English
Kabikankan Mukundaram Mahavidyalaya

The Bengal Famine of 1943 remains one of the darkest chapters in the history of modern India. It was not merely a disaster but a tragic indictment of colonial governance, administrative failure, and wartime economic policies. Millions of men, women, and children perished from starvation, malnutrition, and disease, while countless others were reduced to destitution. Against this backdrop of unimaginable suffering, Dr. Shyama Prasad Mookerjee emerged as one of the foremost public figures who not only exposed the causes of the famine but also devoted himself to extensive relief work. Although history remembers him as a distinguished educationist, parliamentarian, and nationalist leader, his humanitarian intervention during the Bengal Famine deserves equal recognition.

The famine struck Bengal during the Second World War, when British India's economy was severely disrupted by wartime priorities. The loss of rice imports from Burma following the Japanese occupation, inflation, speculative hoarding, disruption of transport, and the colonial government's ill-conceived "Denial Policy" combined to create an unprecedented crisis. While natural calamities such as the cyclone of 1942 and crop diseases affected agricultural production in some areas, subsequent historical research has demonstrated that the famine was largely the result of administrative failures and flawed economic policies rather than an absolute shortage of food. The tragedy claimed millions of lives, making it one of the deadliest famines in the twentieth century.

Dr. Shyama Prasad Mookerjee consistently argued that the Bengal Famine was fundamentally a man-made disaster. In his remarkable work *The Bengal Famine of 1943* (originally published in Bengali as *Panchasher Monnontor* in 1943), he categorically rejected the notion that the catastrophe was caused primarily by nature. He wrote, "এই মন্বন্তর কোনও প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্য ঘটে নাই; যাহারা ভারতবর্ষ এবং বাংলাদেশ শাসনের জন্য দায়ী তাঁহাদের অনুসৃত ভ্রান্ত নীতির ফলেই ইহা ঘটিয়াছে।" ("This famine was not caused by any natural calamity; rather, it resulted from the misguided policies pursued by those who were responsible for the administration of Bengal." *Panchasher Manwantor*, Mookerjee, 43, Translation mine) According to him, administrative negligence, failure to regulate the food market, and the inability of the colonial government to anticipate and address the crisis transformed scarcity into mass starvation.

His speeches in the Bengal Legislative Assembly vividly captured the horrors unfolding across the province. On 17 September 1943, after visiting the famine-stricken districts of Midnapore, he narrated an incident that revealed the unimaginable desperation of the people. (Sengupta, Para 2) He recounted that two individuals died before his very eyes while waiting for food at a relief kitchen. One starving man became so overwhelmed at the sight of food that he collapsed before he could even place a morsel in his mouth. Such eyewitness testimony was far more than political rhetoric; it constituted a moving historical record of the human consequences of governmental failure. Mookerjee also condemned the shocking reality that hospital beds remained vacant while famine victims died unattended on the roads like unwanted entities.

Unlike many political leaders whose engagement remained confined to speeches and legislative debates, Dr. Mookerjee actively participated in relief operations. Recognizing that governmental machinery had failed to cope with the crisis, he mobilized civil society on an unprecedented scale. He brought together numerous voluntary organizations, charitable institutions, business houses, and philanthropic individuals and constituted “Bengal Relief Committee” to coordinate famine relief. Under his leadership, substantial relief funds were raised, community kitchens were established, and food, clothing, and medical assistance were distributed across the affected districts. His work extended far beyond Calcutta into rural Bengal, including severely affected regions such as Midnapore, Contai, and other remote areas where official relief was either inadequate or entirely absent.

His writings reveal that he personally travelled through famine-stricken villages, witnessing scenes of indescribable misery. He described emaciated men, women, and children wandering in search of food, entire families reduced to skeletons, and corpses lying unattended in villages where even wild animals fed upon the dead. He writes,

> In Contai, jackals and stray dogs roam freely, feeding upon human corpses. Men, women, and children—reduced to mere skeletons and clothed in tattered rags—were, irrespective of caste or religion, slowly marching towards death for want of food. I have personally witnessed countless such scenes. *Panchasher Manwantor,* Mookerjee, 49; Qtd. in Senngupta, Para 6, translation mine.

Such graphic descriptions were not literary embellishments but direct observations recorded by a public leader who believed that documenting suffering was itself a moral responsibility. These accounts transformed *Panchasher Monnontor* into one of the earliest contemporary documentary records of the Bengal Famine.

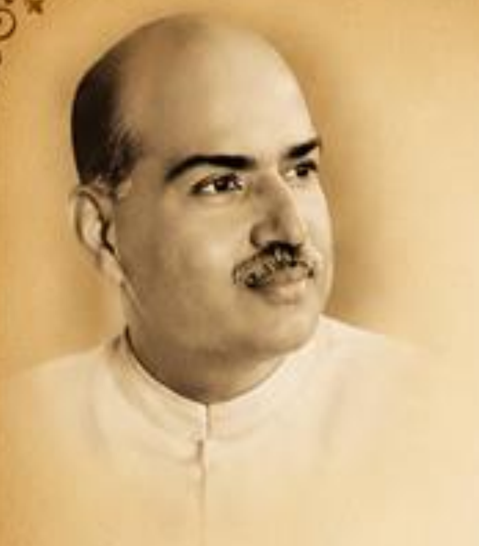

One of the most striking aspects of Dr. Mookerjee's response to the famine was his unwavering appeal for communal harmony. Political narratives have often attempted to portray him solely through the prism of ideological contestation. Yet his speeches during the famine present a very different picture. Faced with mass starvation, he urged Hindus, Muslims, Christians, and members of all communities to rise above political rivalry and sectarian divisions.

In a lecture delivered at *Bangiyo Byabostha Parishad* on 29th March, 1944, he pledged for an unwavering communal harmony, "For the protection of our beloved motherland, cherished equally by Hindus, Muslims and Christians alike, let each one of us rise above personal gain or loss, party differences and communal divisions, and stand united as one great nation in this hour of supreme crisis." (*Panchasher Manwantor*, Mookerjee, 113, Translation mine) His call reflected a profound conviction that human suffering recognizes no religious or political boundaries.

Perhaps one of the most remarkable features of *Panchasher Monnontor* is its forward-looking perspective. In the concluding chapters, Dr. Mookerjee refused to assume that the end of the immediate crisis guaranteed future security. He warned that unless food production, storage, procurement, and distribution were fundamentally reformed, Bengal could once again face similar catastrophes.

In his open letter dated 7th Sept, 1943, to Sir Thomas George Rutherford, the Acting Governor of Bengal, Dr. Shyama Prasad Mookerjee sharply criticized the colonial government's handling of the Bengal Famine and outlined a comprehensive programme to combat the crisis. He emphasized several urgent measures to address both the immediate humanitarian emergency and the long-term consequences of the disaster. His principal demands included: **(1)** the Government must assume full responsibility for ensuring an adequate supply of food and other essential commodities **(2)** Bengal's quota of food grains should be substantially increased, and the existing system of grain procurement and distribution should be thoroughly reformed; **(3)** while voluntary relief organizations deserved full governmental support, the ultimate responsibility for famine relief rested with the State, which should coordinate the efforts of all sections of society; **(4)** relief administration should rise above partisan politics and be entrusted to competent, far-sighted individuals capable of formulating long-term plans for Bengal's economic recovery; **(5)** immediate measures should be taken to rescue women and children, provide shelter for the homeless, preserve educational institutions from collapse, and organize effective medical treatment—particularly against the widespread outbreak of malaria in districts such as Midnapore; and **(6)** relief policies should uphold the dignity of the people of Bengal, ensuring systematic rehabilitation and economic reconstruction. (*Panchasher Manwantor*, Mookerjee, 63)

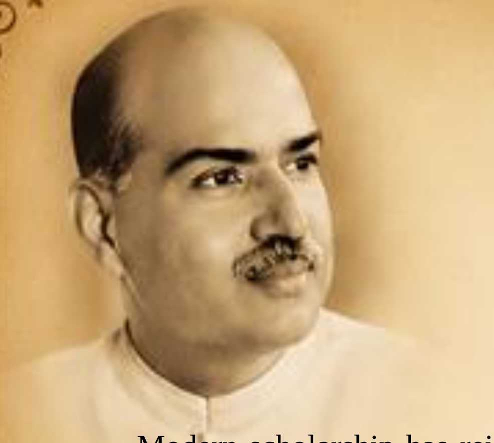

His insistence on long-term food security reveals an understanding of famine that extended beyond emergency relief to structural economic planning. Decades later, such concerns would become central to India's agricultural and food security policies.

Modern scholarship has reinforced several of Dr. Mookerjee's observations. The pioneering work of Amartya Sen demonstrated that famines often occur not because food is entirely unavailable, but because large sections of the population lose the economic entitlement to acquire it. Sen's influential "entitlement approach" showed that failures in distribution, purchasing power, and public policy can produce famine even when food exists within the broader economy. Although developed several decades later, this interpretation resonates strongly with Dr. Mookerjee's contemporary assessment that administrative failure, inflation, and market distortions lay at the heart of Bengal's tragedy.

Today, more than eight decades after the Bengal Famine, Dr. Mookerjee's reflections continue to possess enduring relevance. In an age marked by global food insecurity, climate change, economic inequality, and humanitarian crises, his insistence that famine is fundamentally a failure of governance rather than merely a failure of nature remains profoundly instructive. His call for administrative accountability, social solidarity, and collective humanitarian responsibility transcends its historical context and speaks directly to contemporary debates on disaster management and public policy.

Thus, The Bengal Famine of 1943 stands as a solemn reminder of the catastrophic consequences of governmental neglect. Equally, the life and work of Dr. Shyama Prasad Mookerjee during this crisis remind us that courageous leadership is measured not only by political achievement but also by compassion in moments of collective suffering.

References:

Greenough, Paul R. *Prosperity and Misery in Modern Bengal: The Famine of 1943–44*. Oxford University Press, 1982.

Mookerjee, Shyama Prasad. *Panchasher Monnontor* [*The Bengal Famine of 1943*]. 2nd ed., Bengal Publishers, Baisakh 1351 B.S. (1944). *Internet Archive.*

Sen, Amartya. *Poverty and Famines: An Essay on Entitlement and Deprivation*. Clarendon P, 1981.

Sengupta, Parthasarathi. "Shyamaprasader Chokhe Panchasher Monnontor" ["The Bengal Famine of 1943 through the Eyes of Shyama Prasad Mookerjee"]. *Shanibarer Chithi*, June 2026, https://sanibarerchithi.com/1943-bengal-famine-and-shyama-prasad-mukherjee-analysis/. Accessed 1 July 2026.

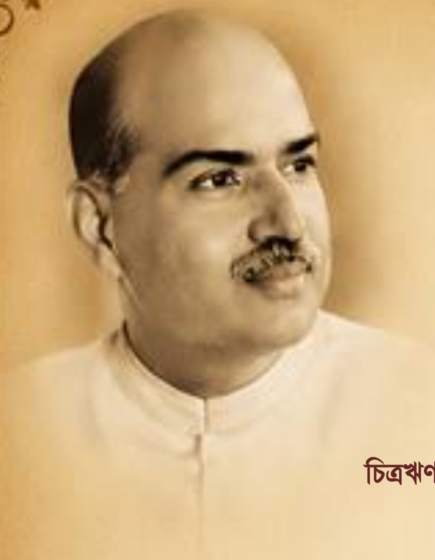

ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
এক বিরল ব্যক্তিত্বের কিছু দুর্লভ আলোকচিত্র

চিত্রঋণ – Official Websit of Dr. Shyama Prasad Mookerjee Research Foundation

https://spmrf.org/dr-syama-prasad-mookerjee-photo-gallery/

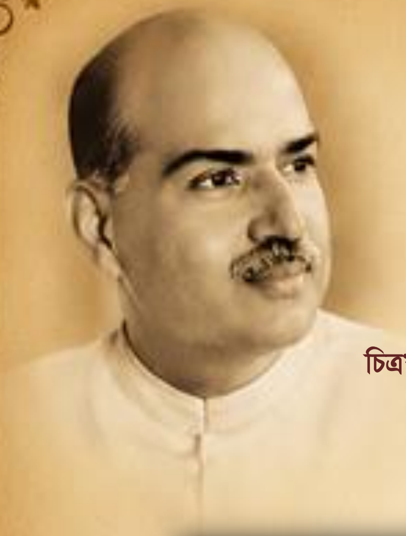

ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
এক বিরল ব্যক্তিত্বের কিছু দুর্লভ আলোকচিত্র

চিত্রঋণ – Official Websit of Dr. Shyama Prasad Mookerjee Research Foundation

https://spmrf.org/dr-syama-prasad-mookerjee-photo-gallery/

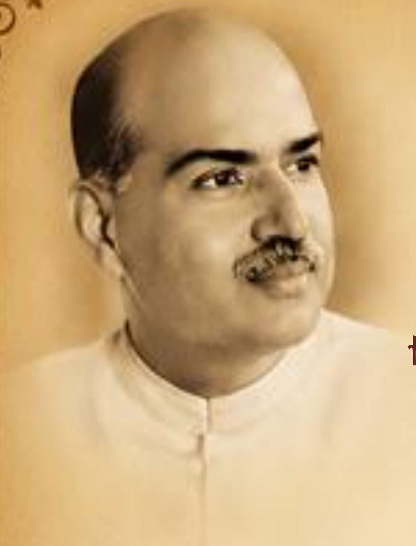

ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এর হস্তাক্ষর

চিত্রঋণঃ Official Facebook Page of NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

https://www.facebook.com/share/p/1Rcyjzo8rD/

POSTED ON: 23/06/2026

সম্পূর্ণানন্দজীকে লেখা চিঠি, তারিখ ১৯/০৫/১৯৪২

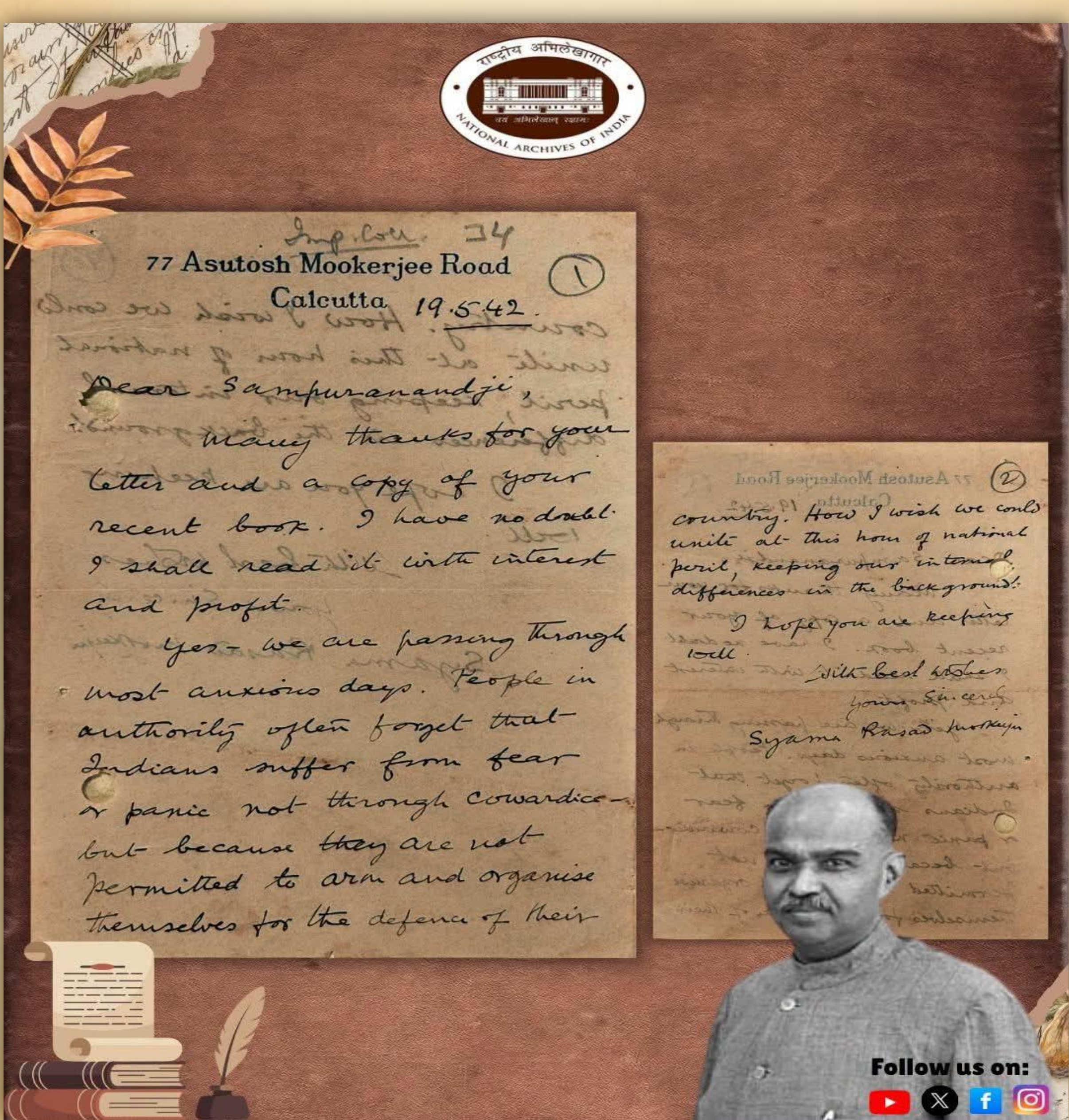

Imp. Coll. 34

77 Asutosh Mookerjee Road
Calcutta 19.5.42.

(1)

Dear Sampuranandji,

Many thanks for your letter and a copy of your recent book. I have no doubt I shall read it with interest and profit.

Yes – we are passing through most anxious days. People in authority often forget that Indians suffer from fear or panic not through cowardice – but because they are not permitted to arm and organise themselves for the defence of their

(2)

country. How I wish we could unite at this hour of national peril, keeping our internal differences in the background.

I hope you are keeping well.

With best wishes
Yours sincerely
Syama Prasad Mookerjee

পরিশেষে...

মহামানব যুগে যুগে অবতীর্ণ হন মানবসমাজকে সত্য, সাহস, আদর্শ ও আত্মত্যাগের পথে পরিচালিত করতে। ভারতকেশরী ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সেই বিরল মহামানবদের অন্যতম, যাঁর জীবন ও কর্ম আজও আমাদের জাতীয় চেতনাকে আলোকিত করে।

তাঁর ১২৫তম জন্মবার্ষিকীর এই পবিত্র লগ্নে 'ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় স্মারক পুস্তিকা'-র বৈদ্যুতিন সংস্করণ প্রকাশ করতে পেরে আমরা কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম মহাবিদ্যালয় পরিবার অত্যন্ত আনন্দিত, গর্বিত ও কৃতজ্ঞ। গত পক্ষকালব্যাপী আমাদের মহাবিদ্যালয়ে 'ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় স্মৃতি পক্ষ' উদ্‌যাপনের মাধ্যমে তাঁর জীবন, কর্ম, দর্শন ও দেশপ্রেমকে নানাভাবে স্মরণ ও অনুধাবনের এক আন্তরিক প্রয়াস গ্রহণ করা হয়েছিল। বক্তৃতা, আলোচনা, বিতর্ক, প্রবন্ধ রচনা এবং অন্যান্য বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকা, শিক্ষাকর্মী ও ছাত্রছাত্রীরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছেন। সেই ধারাবাহিকতারই এক মূল্যবান সংযোজন এই স্মারক পুস্তিকার বৈদ্যুতিন প্রকাশ।

আজ তাঁর জন্মবার্ষিকীতে আমরা সকলে এই অঙ্গীকার করি যে, তাঁর আদর্শকে হৃদয়ে ধারণ করে সত্যনিষ্ঠ, কর্মমুখর ও মানবকল্যাণে নিবেদিত জীবন গঠনের পাশাপাশি অবিচল দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে ভারতমাতার সেবায় আত্মনিয়োগ করব।

ভারতকেশরী ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের পবিত্র স্মৃতির প্রতি জানাই আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধাঞ্জলি।

বিনীত

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম মহাবিদ্যালয় এর
অধ্যক্ষ, শিক্ষক-শিক্ষিকা, শিক্ষাকর্মীবৃন্দ ও
ছাত্রছাত্রীরা
কেশবপুর, হুগলী

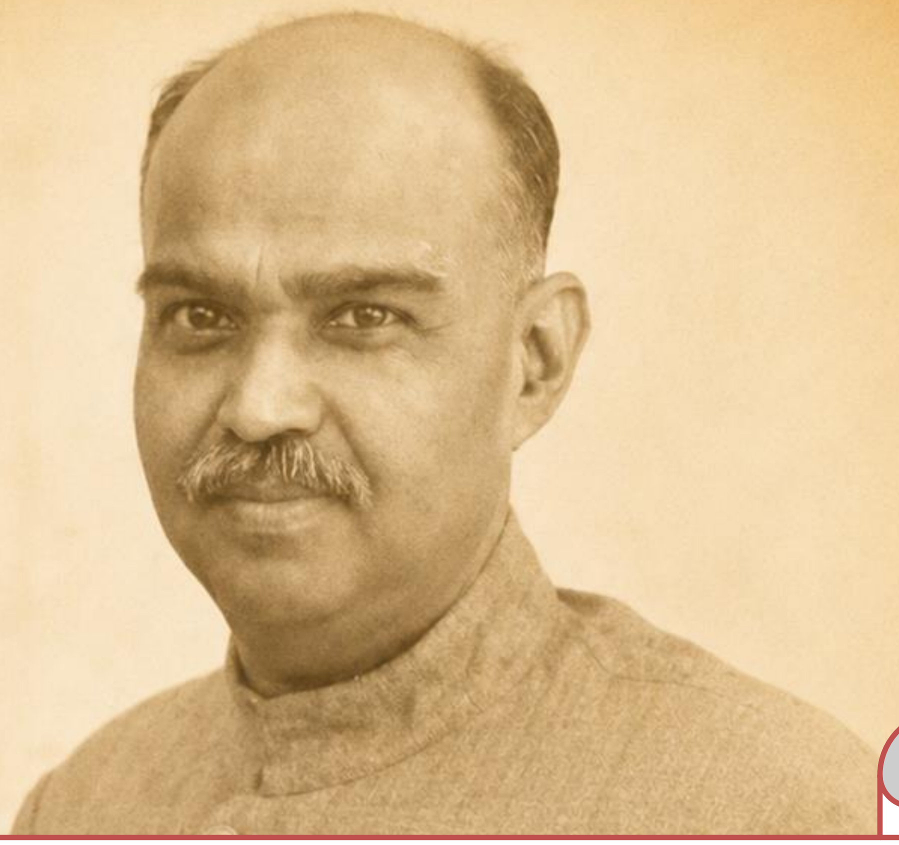

“Whatever work you undertake, do it seriously, thoroughly and well; never leave it half-done or undone, never feel yourself satisfied unless and until you have given it your very best. Cultivate the habits of discipline and toleration. Surrender not the convictions you hold dear but learn to appreciate the points of view of your opponents.”

Speech delivered at Scottish Church College, Kolkata on 7th December, 1935.

“ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় স্মারক পুস্তিকা”
প্রকাশকঃ কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম মহাবিদ্যালয়, কেশবপুর, হুগলী, ৭১২৪১৩